গ্লোবাল ডায়ালগ

৬.৪

১৭ টি ভাষায় বছরে চারটি সংখ্যা

সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি ও ক্ষমতা

এন্থনি গিডেন্স

গ্রিসের অর্থনৈতিক স্থবিরতা

ভ্যাসিলিস ফুওসকাস,
মারিয়া মারকান্তোনাতোউ,
জন মিলিওস,
স্পাইরোস স্যাকলেরোপোলোস,
স্ট্রাতোস জর্জোলাস

লাতিন আমেরিকায় গর্ভপাত

জুলিয়া ম্যাকরেনোল্ডস-পেরেজ,
সুজানা লার্নার, লুসিয়া ম্যালগার,
এগনেস গুইলাইমি,
এরিকা বুছে

আরব বিশ্বে সামাজিক বিজ্ঞান

মোহাম্মদ বামিয়েহ,
সেতেনি শামি,
ইদ্রিস জেবারি

বিশেষ কলাম

> ম্যাকডোনাল্ডাইজেশন ও ভোগ নিয়ে জর্জ রিটজারের সাথে আলাপচারিতা

> ৪০+ থেকে আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞানের সাথে

> জাপানিজ সম্পাদনা পরিষদের পরিচিতি

GD
ভলিউম ৬ / সংখ্যা ৪ / ডিসেম্বর ২০১৬
www.isa-sociology.org/global-dialogue/

ম্যাগাজিন

International Sociological Association

> সম্পাদকীয়

পেছনে ফিরে, ভবিষ্যতের পানে

গ্লোবাল ডায়লগের বিগত ছয় বছরের যাত্রাকে পর্যালোচনা করে এই সংখ্যা অতীতে ফিরে তাকিয়েছে ও ভবিষ্যৎপানে চেয়ে দেখা অব্যাহত রেখেছে। ইনদিগ্নাদোস, অকুপাই, আরর বসন্ত ইত্যাদির মত ক্ষণস্থায়ী সামাজিক আন্দোলন থেকে সরে এসে ডানপন্থীদের আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে এবং মিশর, তুরস্ক, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, ফিলিপাইন, আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিলের মত দেশে কর্তৃত্ব প্রিয় শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে-এর কারণ অনুসন্ধানে আগ্রহী হয়েছে। জাতিরাষ্ট্রগুলোকে ঘিরে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের এ প্রচণ্ড তাণ্ডবের দিকে তাকালে বিশ্বব্যাপী এই প্রবণতার আংশিক উৎসের সন্ধান পাওয়া যাবে। এ পুঁজিবাদ সরকারি স্বায়ত্বশাসনের প্রাণরস শুষে নিচ্ছে ও পুরো মহলকে কলুষিত করছে। প্রচলিত নির্বাচনী রাজনীতিকেও কলঙ্কিত করছে। ফলশ্রুতিতে বাম ও ডান উভয় ধারা: মূলত ডানপন্থাই জনগণতন্ত্রবাদের (Populism) জন্ম দিচ্ছে।

তাই, তাত্ত্বিক ও একসময়ে বহুল প্রচলিত বিশ্বায়নের অপ্রতিরোধ্য দানবীয় রথ ধারণা-টিকে জনপ্রিয়কারী এন্থনি গিডেন্স-এর একটি সাক্ষাৎকার দিয়ে বর্তমান সংখ্যাটির সূচনা করাই আমাদের জন্য সমীচিন হবে। একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে তিনি যেসকল সমস্যা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন, হাউজ অব লর্ডস-এর একজন সদস্য হিসেবে তাঁর রাজনৈতিকের বেশেও তিনি সেগুলোকে সকলের সামনে উপস্থাপনের কাজটি অব্যাহত রেখেছেন-যেসব বিষয়ের ভেতর জলবায়ু পরিবর্তন এবং ডিজিটাল যুগের তাৎপর্য তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

সিরিয়া আন্দোলনের পরিণতি বর্ণনার মাধ্যমে বিশ্বায়নের অন্ধকার দিক খুঁজে পাওয়া সম্ভব, শুরুতে যে আন্দোলন ইউরোপিয় ইউনিয়নকে প্রায় বশীভূত করে ফেলেছিল, কিন্তু ক্ষমতার পালা যখন বদলে গেল, তখন এটা গ্রিসকে উল্টো কর্তৃত্বাধীন করে ফেলল। এই সংখ্যায় আমরা ইউরোপিয় ইউনিয়ন কর্তৃক গ্রিসের উপর ব্যয়সংকোচন নীতি আরোপের সর্বনাশা ফলাফল ব্যাখ্যাকারী পাঁচটি প্রবন্ধ প্রকাশ করছি, যে ব্যয়স-ঙ্কোচন নীতি গ্রিসে অবর্ণনীয় দরিদ্রতা ডেকে এনেছে অথচ সমাজের উপরতলাকে দিয়েছে অগণিত ধন-সম্পত্তি।

লাতিন আমেরিকায় এক দশক বা তার বেশি সময় ধরে চলে আসা সমাজতান্ত্রিক গণ-তন্ত্র, অর্থাৎ তথাকথিত গোলাপি জোয়ারের (pink tide) প্রতিক্রিয়ায় একে একে দেশগুলো ডানপন্থার দিকে নিমজ্জিত হয়েছে। গর্ভপাতকে ঘিরে জন্ম নেওয়া বিবাদের মধ্য দিয়ে যে পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে, সে সম্বন্ধে আমরা এখানে তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছি। আর্জেন্টিনা, পেরু ও মেক্সিকোতে যে অভিনব প্রতিবাদী বিক্ষোভ দেখা গেছে, সেটি রাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘর্ষের রূপ পরিগ্রহ করেছে। বিশেষ করে গর্ভাবস্থাকে এড়িয়ে যেতে বা ব্যাঘাত করতে সাধারণ ওষুধের ব্যবহার নিয়ে যে বিবাদের সূত্রপাত হয়েছে তা সত্যি কৌতূহলোদ্দীপক।

আরব সামাজিক বিজ্ঞানের পরিণতি নিয়ে আমাদের তিনটি নিবন্ধ আছে। আরব বিশ্বে সামাজিক বিজ্ঞানের চর্চার অবস্থা নিয়ে মোহাম্মদ বামিয়েহ রচিত প্রথম প্রতিবেদনটি এই আলোচনায় চমক নিয়ে এসেছে। তিনি একটি সারাংশমূলক রচনার মাধ্যমে সম্মে-লনটি শুরু করেন। এরপর সেতেনি শামি তাঁর লেখায় সামাজিক বিজ্ঞানের পরিবর্তন-শীল অবকাঠামোর গুরুত্বের বিষয়ে জোর দিয়েছেন। ইদ্রিস জেবারি আরব বসন্ত ও এর অন্তিম পরিণতির তাৎপর্য নিয়ে কিছু সমালোচনামূলক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তিনি সম্ভাব্যতার মাত্রা বাড়িয়ে বলেছেন, আরব বসন্ত সামাজিক বিজ্ঞানে জীবনীশক্তি ও নতুন দিকনির্দেশনার যোগান দিয়ে চলেছে।

আমরা সুপরিচিত সমাজবিজ্ঞানী জর্জ রিটজারের সাক্ষাৎকারের একটি অংশবিশেষ প্রকাশ করেছি। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন কসোভোর এক তরুণ ও উদ্যমী সমাজবিজ্ঞা-নী ল্যাবিনট কুনুশেভকি। এডওয়ার্ড টিরাকিয়ান ১৯৭৪ সাল থেকে শুরু হওয়া আইএ-সএ-এর কংগ্রেসগুলোর স্মৃতিচারণ করে অতীতের এক ঝলক আমাদের সামনে উপ-স্থাপন করেছেন। সর্বশেষে আমরা জাপানি সম্পাদনা পরিষদের পরিচয় তুলে ধরেছি যেটির নেতৃত্বে আছেন সাতোমি ইয়ামামোতো। তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে অনুবাদকর্মের আকুলতায় আত্মনিয়োগ করার জন্য অনুপ্রেরণা যোগান। এর সাথে সংযোগ সাধন করে আমি *গ্লোবাল ডায়লগের* ১৭তম ভাষা হিসেবে বাংলার অভিষেক ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত বোধ করছি। হাবিবউল খন্দকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশের ঢাকাস্থ এক ঝাঁক উদ্যমী সমাজবিজ্ঞানী এটি সম্পাদন করেছেন।

> ISA-এর ওয়েবসাইটে **১৭টি ভাষায় অনূদিত *গ্লোবাল ডায়লগ* ম্যাগাজিনটি পাওয়া যাবে।**
> **লেখা পাঠাতে পারেন এই ইমেইলেঃ** burawoy@berkeley.edu

*স্বনামধন্য বৃটিশ সমাজবিজ্ঞানী ও তাত্ত্বিক **এন্থনি গিডেন্স** বর্তমানে হাউস অফ লর্ডসের সদস্য যিনি রাজনীতিতে সমাজবিজ্ঞানীর প্রতিকূলতা নিয়ে পর্যালোচনা করেন।*

গ্রিসের অর্থনৈতিক স্থবিরতা। *ইউরোপিয় ইউনিয়-নে গ্রিসের সদস্যপদ থাকা না থাকা নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের সমঝোতাগুলো ভেস্তে যাওয়ার কারণগু-লো পাঁচটি প্রবন্ধে উঠে এসেছে।*

লাতিন আমেরিকায় গর্ভপাত। *গর্ভপাত নিয়ে আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো ও পেরুতে চলমান প্রতিবা-দী সংগ্রামের পর্যালোচনা উঠে এসেছে তিনটি প্রবন্ধে।*

GD

SAGE প্রকাশনীর উদার অনুদানে ***গ্লোবাল ডায়লগ*** প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

> Editorial Board

Editor: Michael Burawoy.

Associate Editor: Gay Seidman.

Managing Editors: Lola Busuttil, August Bagà.

Consulting Editors:
Margaret Abraham, Markus Schulz, Sari Hanafi, Vineeta Sinha, Benjamín Tejerina, Rosemary Barbaret, Izabela Barlinska, Dilek Cindoğlu, Filomin Gutierrez, John Holmwood, Guillermina Jasso, Kalpana Kannabiran, Marina Kurkchiyan, Simon Mapadimeng, Abdul-mumin Sa'ad, Ayse Saktanber, Celi Scalon, Sawako Shirahase, Grazyna Skapska, Evangelia Tastsoglou, Chin-Chun Yi, Elena Zdravomyslova.

Regional Editors

Arab World:
Sari Hanafi, Mounir Saidani.

Argentina:
Juan Ignacio Piovani, Pilar Pi Puig, Martín Urtasun.

Bangladesh:
Habibul Haque Khondker, Hasan Mahmud, Juwel Rana, US Rokeya Akhter, Toufica Sultana, Asif Bin Ali, Khairun Nahar, Eashrat Jahan Eyemoon, Kazi Fadia Esha, Helal Uddin.

Brazil:
Gustavo Taniguti, Andreza Galli, Ângelo Martins Júnior, Lucas Amaral, Benno Alves, Julio Davies.

India:
Ishwar Modi, Rashmi Jain, Jyoti Sidana, Pragya Sharma, Nidhi Bansal, Pankaj Bhatnagar.

Indonesia:
Kamanto Sunarto, Hari Nugroho, Lucia Ratih Kusumadewi, Fina Itriyati, Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Benedictus Hari Juliawan, Mohamad Shohibuddin, Dominggus Elcid Li, Antonius Ario Seto Hardjana.

Iran:
Reyhaneh Javadi, Abdolkarim Bastani, Niayesh Dolati, Marjan Namazi, Vahid Lenjanzade.

Japan:
Satomi Yamamoto, Yutaro Shimokawa, Shinsha Kameo, Mizuki Ichikawa, Hayato Ishihara, Hiroki Kawabata, Hiromi Murakami, Kenta Kajitani, Kento Kusudo, Hirotaka Tanaka, Chiye Yamada.

Kazakhstan:
Aigul Zabirova, Bayan Smagambet, Adil Rodionov, Gani Madi.

Poland:
Jakub Barszczewski, Adrianna Drozdrowska, Krzysztof Gubański, Justyna Kościńska, Kamil Lipiński, Mikołaj Mierzejewski, Karolina Mikołajewska-Zając, Adam Müller, Zofia Penza, Teresa Teleżyńska, Anna Wandzel, Justyna Zielińska, Jacek Zych.

Romania:
Cosima Rughiniș, Corina Brăgaru, Nicoleta-Mădălina Ailincăi, Costinel Anuța, Adriana Bondor, Alexandra Ciocănel, Tatiana Cojocari, Andrei Dobre, Iulian Gabor, Ștefania Cristina Ghiocanu, Alexandra Isbășoiu, Rodica Liseanu, Mădălina Manea, Anca Mihai, Andreea Elena Moldoveanu, Rareș-Mihai Muşat, Oana-Elena Negrea, Mioara Paraschiv, Ion Daniel Popa, Ioana Silistraru, Eliza Soare, Adriana Sohodoleanu, Diana Tihan, Elena Tudor, Carmen Voinea, Raisa-Gabriela Zamfirescu.

Russia:
Elena Zdravomyslova, Anna Kadnikova, Asja Voronkova.

Taiwan:
Jing-Mao Ho.

Turkey:
Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.

Media Consultants: Gustavo Taniguti.

> এ সংখ্যায় বিষয়

সম্পাদকীয়: পেছনে ফিরে, ভবিষ্যতের পানে ২

সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি ও ক্ষমতা: এন্থনি গিডেন্সের সাথে আলাপচারিতা
পিটার কোলার্জ, যুক্তরাজ্য ৪

> গ্রিসের অর্থনৈতিক স্থবিরতা

গ্রিস: ভূ-রাজনৈতিক ইতিহাস ও দেউলিয়াপনা
ভ্যাসিলিস কে. ফ্যুওসকাস, ইউকে ৭

গ্রিসে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত মিতব্যয়ীতানীতি
মারিয়া মারকান্তোনাতোউ, গ্রিস ১০

সিরিযা: পরাভব থেকে বাস্তববাদিতার পথে
জন মিলিওস, গ্রিস ১২

গ্রিক অর্থনৈতিক সংকটের সুফলভোগী ও ভুক্তভোগী
স্পাইরোস স্যাকলেরোপোলোস, গ্রিস ১৫

গ্রিক বেইল আউট-রাষ্ট্রীয় সাংগঠনিক অপরাধ
স্ট্রাতোস জর্জোলাস, গ্রিক ১৭

> গ্রিসের অর্থনৈতিক স্থবিরতা

মিসোপ্রজলের যুগেও আর্জেন্টিনায় গর্ভপাত বৈধতা নিয়ে বিরোধ
জুলিয়া ম্যাকরেনোল্ডস-পেরেজ, ইউএসএ ১৯

মেক্সিকোর গর্ভপাত আইনের বিলোপ
সুজানা লার্নার, মেক্সিকো; লুসিয়া ম্যালগার, মেক্সিকো; এগনেস গুইলাইমি, ফ্রান্স ২২

গর্ভপাত সহিংসতা: একটি পেরুভিয়ান সংগ্রাম
এরিকা বুছে, পেরু ২৪

> আরব বিশ্বে সামাজিক বিজ্ঞান

আরব বিশ্বে সামাজিক বিজ্ঞান
মোহাম্মদ এ. বামিয়েহ, উইএসএ ২৬

আরব অঞ্চলে সামাজিক বিজ্ঞানের নতুন পরিকাঠামো
সেতেনি শামি, লেবানন ২৮

আরব সামাজিক বিজ্ঞান- আরব বসন্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থা
ইদ্রিস জেবারি, লেবানন ৩১

> বিশেষ কলাম

জর্জ রিটজার: ম্যাকডোনাল্ডাইজেশন ও ভোগ
ল্যাবিনট কুনুশেভকি ৩৪

ইতিহাসের মোড়: ৪০+ বছর ধরে আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞানের সাথে
এডওয়ার্ড টিরাকিয়ান, ইউএসএ ৩৬

জাপানিজ দ্বিতীয় সম্পাদনা পরিষদের পরিচিতি ৩৮

> ক্ষমতা, রাজনীতি এবং সমাজবিজ্ঞান

এন্থনি গিডেন্সের সাথে আলাপচারিতা

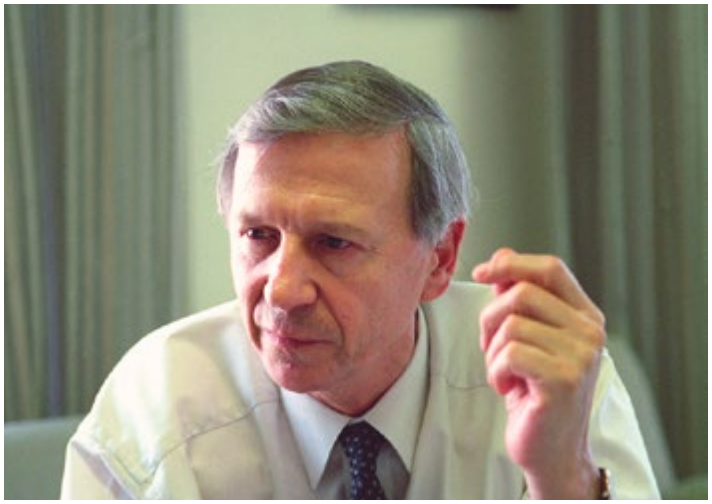

এন্থনি গিডেন্স।

এন্থনি গিডেন্স ১৯৭০-এর দশকে ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানের নবজাগরণে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এ সময় তিনি সমাজবিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য কিছু বই লেখেন। যেগুলো আধুনিক যুগের জন্য ধ্রুপদী সমাজতত্ত্বের পুনর্ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। তিনি কাঠামোবদ্ধ দুনিয়ায় কর্তৃত্বের প্রশ্নটিকে-ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রক্রিয়ার সাথে বৃহৎ শক্তিগুলোর সংযুক্তির বিষয়টিকে এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের প্রাসঙ্গিকতাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। সম্প্রতি তিনি ডিজিটাল বিপ্লবের পরিণতি কী হতে পারে এবং জলবায়ু পরিবর্তন মানব অস্তিত্বকে যে হুমকির ভেতর ফেলে দিয়েছে সে ব্যাপারে বক্তব্য রেখেছেন। তিনি ৩০টিরও অধিক বই লিখেছেন। লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সের প্রাক্তন অধিকর্তা ও এমিরেটাস অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ২০০৪ সাল থেকে তিনি হাউজ অফ লর্ডস-এর একজন সদস্য হিসেবে বর্তমান রয়েছেন। তিনি বর্তমান সাক্ষাৎকারটিতে রাজনীতিতে সমাজবিজ্ঞানের অবস্থান অনুধাবন করতে চেয়েছেন।

পিটার কোলার্জ সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয় (ইউকে) থেকে সমাজবিজ্ঞানে পিএইচডি অর্জন করেন। টেকনোপলিস গ্রুপের একজন নীতি বিশ্লেষণী পরামর্শক হিসেবে তিনি বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন। তিনি যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও ইউরোপিয় ইউনিয়ন সহ বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার কতিপয় কর্মপন্থা বিষয়ক গবেষণাপত্র ও মূল্যায়নপত্র লিখেছেন। ২০১৬ সালে প্যালগ্রেভ ম্যাকমিলান থেকে তাঁর *Giddens and Politics Beyond the Third Way: Utopian Realism in the Late Modern Age* বইটি প্রকাশিত হয়। তিনি ২০১৬ সালের ৮ই জুন যুক্তরাজ্যের হাউজ অফ লর্ডসে বসে গিডেন্সের বর্তমান সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন।

পিকে: আপনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখালেখি করেছেন, যেমন: স্ট্রাকচারেশন তত্ত্ব (structuration theory), ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (historical materialism), অবসানের নিকটবর্তী আধুনিকতা (late modernity) এবং বিশ্বায়ন (globalization), ব্যক্তিগত জীবন ও যৌনতার পরিবর্তন , তৃতীয় পন্থা (the third way), জলবায়ু পরিবর্তন, ইউরোপিয় ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ এবং সম্প্রতি ডিজিটাল বিপ্লব নিয়ে আপনার মতামত গুরুত্ব বহন করতে শুরু করেছে। আপনার কি মনে হয় আপনার বিভিন্ন বা অধিকাংশ গবেষণা কর্মের মধ্যে বিশেষ কোন যোগসূত্র রয়েছে?

এজি: আমার সমস্ত কাজের মূল লক্ষ্য ছিল আধুনিকতার চরিত্র বিশ্লেষণ করা। শিল্পায়িত সমাজবিন্যাসের আবির্ভাব ও সারা বিশ্বব্যাপী-এর বিস্তার নিয়ে আলোচনা করেছি। এটা হলো স্মরণকালের সবচেয়ে বৈপ্লবিক ও রূপান্তরশীল যুগ। আমার কাছে ইতিহাসকে যথেষ্ট রকমের ক্রমবিবর্তনবিরোধী মনে হয়: ইতিহাসের ক্রমবিকাশ নির্দেশক কোন মডেল নেই। ইতিহাসের মানুষগুলো সবসময় তাদের পরিবেশ, সমাজ ও ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কাজ করে থাকে। এ প্রেক্ষাপটগুলো তাদের কর্ম নির্ধারণ করে দেয় কিন্তু একই সাথে তারা এসব প্রসঙ্গকে ঢেলে সাজায় এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ উপায়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে থাকে। আমরা আদতে যে সবাই এক একজন বুদ্ধিমান মানুষ সেটা ডুর্খেইমের সমাজবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি স্বীকার করে না, বরং আমাদের সবাইকে এক একজন নিষ্ক্রিয় কর্তা মনে করে। আমি ডুর্খেইমের মত মনে করি না। অ্যার্ভিং গফম্যান-আমার চোখে সম্ভবত সবচেয়ে বড় সমাজবিজ্ঞানী-তিনি মানুষের দৈনন্দিন কৃতকর্মের শিল্পকুশলতার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন, মানুষ কিন্তু তার শিল্পকুশলা সম্পর্কে অকাট্যরূপে জ্ঞাত না হয়েই দৈনন্দিনের কাজগুলো করে থাকে। এই মতামতটির সাথে আরো বড় বড় রকমের কাঠামোবদ্ধ প্রক্রিয়াগুলোর সম্বন্ধ স্থাপন করাই আমার এতদিনের প্রয়াস ছিল। এই কাজটা এত সহজ নয় কিন্তু ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়: অতীতের সমাজবৈজ্ঞানিক আলোচনার একটা বড় অংশে আমাদেরকে বৃহত্তর সামাজিক ভিত্তিসমূহের কেবল ক্রীড়ানক স্বরূপ দেখানো হয়েছে। আমি বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে অবস্থিত সম্পর্কের সূক্ষ্মতা সবার সামনে প্রকাশ করতে চেয়েছি। আমি যে সবসময় সম্পর্ক ও যোগাযোগে রূপান্তর প্রক্রিয়া নিয়ে কৌতূহলী প্রকাশ করে এসেছি। আমরা যে বৃহৎ পরিসর ও তার সমস্যাগুলো মোকাবেলা করার চেষ্টা করি সেগুলো যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি আমাদের দৈনন্দিন জীবন ও ব্যক্তিত্ব রূপান্তরের ঘটনাসমূহ সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

পিকে: আপনাকে যদি আপনার কাজগুলোর থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন অন্বেষণকারী কাজটি নির্বাচন করতে বলা হয় তাহলে কোনটির কথা বলতেন?

এজি: আমরা এখন যে বিষয়টির কথা আলোচনা করছি সেটাই হলো আমার বিবেচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ: মানুষ কী করে অপরিমেয় সূক্ষ্ম মিথস্ক্রিয়ায় (interaction) একই সাথে নিজের জীবন যাপন করে এবং বৃহত্তর সমাজকাঠামোর অংশ হয়, ও সমাজকাঠামোর অধীন হয়ে চলে সেই মিথস্ক্রিয়ার (interaction) বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটা রাজনীতির বেলায় যেমন সত্য, অন্য বিষয়গুলোতেও তেমন সত্য। অতি পরিকল্পিত কর্মপন্থাও অনেক সময় যথেষ্ট নয় এবং প্রায় ক্ষেত্রেই হিতে বিপরীত হতে পারে।

পিকে: আমার ২০১৬ সালের Giddens and Politics Beyond the Third Way বইটিতে আমি, আপনার কাল্পনিক বাস্তববাদ (utopian realism) প্রত্যয়টির ওপর জোর দিয়েছি। আপনি কি এখনো এই ধারণাটি লালন করেন?

এজি: কাল্পনিক বাস্তববাদ (utopian realism) প্রত্যয়টি আমি এখনও ব্যবহার করি। এখানে মূল প্রতিকূলতার বিষয়গুলো হল কাল্পনিক বাস্তববাদকে মূলধারার রাজনীতির সাথে সংযুক্তিকরণ , যদিও তারা উভয়ই পরস্পর বিপরীতধর্মী। আদর্শ বিবর্জিত

>>

রাজনীতি আসলে উদ্দেশ্যহীন গতিপথের শামিল। আমাদেরকে সময়ের যেকোন বিন্দুতে প্রচলিত স্থিতাবস্থার বিপরীতে অবস্থানরত সম্ভাব্য পরিস্থিতিকে মনশ্চক্ষে দেখতে হবে। একইসাথে, আদর্শগুলো তার নিজস্ব ভুবনগুলোর আদতে নিজেরা নিজেরা কপর্দকশূন্য। আমার কাছে মনে হয় আদর্শগুলোর ভূমিকা বুঝতে গেলে কাল্পনিক বস্তুবাদের ধারণা বেশ কাজে দেয়। একদিকে যেমন বর্তমান সময়কে ছাপিয়ে চিন্তা করতে পারে, অন্যদিকে বাস্তব ও আদর্শিক ভুবনগুলোর মধ্যকার প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে বের করে। রাজনীতি এবং বিশ্ব সম্পর্কে ভাবতে এটা একটি সংবেদনশীলতা সৃষ্টিকারী কৌশল হিসেবে কাজ করে। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে, যে দল শুধুমাত্র নির্বাচন জেতার উদ্দেশ্যেই নিজেকে উৎসর্গ করবে, সে আদতে কোন নির্বাচনই জিততে পারবে না; এবং সেইদলও নির্বাচনে জিততে পারবে না-যে দলের আদর্শিক অবস্থান তুঙ্গে থাকা সত্ত্বেও তারা জনগণের প্রকৃত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মৌলিক সমস্যাগুলোর সাথে তাদের আদর্শগুলোর কোন সংযোগ স্থাপনে ব্যর্থ হবে। আমরা সকলেই জানি যে, এই দুটো দিকের সমন্বয় সাধনের মত জটিল সমস্যাটির সমাধান করা কতটা কঠিন।

পিকে: আপনি ১৯৯০-এর দশকে বিশ্বায়ন ও তৃতীয় পন্থার উপর রাজনীতি বিষয়ক কিছু কাজ করেছেন। সে বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখে বর্তমানের রাজনৈতিক ও নীতিমালাগুলোর দিকে তাকালে আপনি কী মতামত দেবেন? সেই বিতর্কে এমন কোন বিষয় কি রয়েছে যেটা আপনি আজকের দিনেও গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন অথচ সে সময় ভাল মতো আলোচিত হয়নি?

এজি: এ বিষয়টি মনে করা একটু কঠিন, কিন্তু সেই সময়ে বিশ্বায়নের ধারণাটি (যার মানে হল, সারা বিশ্বব্যাপী ব্যক্তি, সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া) কিছুটা নতুন ছিল, বিশেষ করে রাজনীতির মাঠে। রাজনৈতিক নেতাদেরকে দিয়ে ব্যাপারটা গুরুত্বসহকারে নেওয়ানোর কাজটা শুরুর দিকে কষ্টসাধ্য ছিল। তারা আমার দিকে হতবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। তারপর হঠাৎ রাতারাতি সবকিছু বদলে গেল। রাজনীতিবিদদেরকে বিশ্বায়ন নিয়ে কথা বলানো ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছিল না, যদিও অধিকাংশ সময় তাদের মতামত কিছুটা আনাড়ি হয়ে যেত। দুর্ভাগ্যক্রমে, অধিকাংশ রাজনীতিবিদ এবং অনেক সমাজবিজ্ঞানীও প্রত্যয়টিকে প্রাথমিকভাবে, অথবা সম্পূর্ণরূপে, বৈশ্বিক বাজারের সম্প্রসারণ বোঝাতে ব্যবহার করেছেন। সর্বোপরি, বিশ্বায়নের মূল চালিকাশক্তি তখনকার মত এখনও হলো ডিজিটাল বিপ্লবের অস্বাভাবিক অগ্রগতির সাথে সাথে যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নয়ন বিশেষ করে, ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা।

আমি তৃতীয় পন্থা শব্দটি অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্যবহার করেছিলাম। আমার কাছে, এটার অর্থ কিছুটা মধ্যপন্থার মত করে বাম ও ডানের মাঝামাঝি কোন রাজনৈতিক অবস্থানের জন্ম দেওয়া মনে হয় না। অথচ এটাকে আমি নব্যউদারনীতিবাদের কোন সংস্করণ হিসেবেও দেখতাম না, যেটা কিনা অবাধ বাজার ব্যবস্থায় নিরঙ্কুশভাবে বিশ্বাস করে। আমার ১৯৯৮-সালের বই *The Third Way* তে আমি যেমনটি লিখেছিলাম, "বিশ্ব অর্থনীতিতে সবচেয়ে জরুরি সমস্যা হল আর্থিক বাজারগুলোকে বিধি নিয়মে আবদ্ধ করা"। তখনকার দিনে, এবং আজকেও আমি সক্রিয় সরকারের উপর গুরুত্ব দেওয়ায় বিশ্বাসী। যদিও এটাকে সহজেই রাষ্ট্র বলে চালিয়ে দেওয়াটা উচিত হবে না, অন্যান্য প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থাগুলো থেকেও কিন্তু এটা উঠে আসতে পারে। আমি তখনকার দিনের মত আজকেও, বৈশ্বিক সরকারের ব্যবস্থাপনা বিকাশ সাধনে বিশ্বাসী, যদিও সেটা অনেক প্রতিকূল।

আমি কী লিখেছি কেউ যদি সেটা গভীরভাবে পর্যালোচনা করে তাহলে সহজেই দেখতে পাবে, আমার কাছে অসমতা একটি বড় সমস্যা। উৎপাদনশীলতা বাড়াতে না পারার ব্যর্থতায় নিম্ন স্তরের কাজ করা মানুষগুলোর মজুরি বাড়েনি, যার ফলে সম্পদ ধন পিরামিডের শিখরে চরম রকমের অসমতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং এ কারণে অসমতার সমস্যাটি এখন আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে। টমাস পিকেটির *Capital in the Twenty-First Century* বইটি বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। কারণ বইটি এই চোখ ধাঁধানো অসমতাগুলো উৎপাদনের কাঠামোগত কারণগুলো কী হতে পারে-সে ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং একই সাথে সেগুলো নিরসনে সম্ভাব্য কৌশলগুলোও বাতলে দেয়।

কিন্তু রাজনীতি অবশ্যই একটি জাতীয় বিষয় আর পৃথিবী হলো বৈশ্বিক বিষয়। সুতরাং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়ে গিয়েছে: আমরা কী করে জাতীয় রাজনীতির সাথে মজ্জাগতভাবে আন্তর্জাতিক বিশ্বের সামঞ্জস্যবিধান করতে পারি, সেটা এখনও আমাদের কাছে একটি বড় প্রতিকূলতা। আমরা প্রত্যেকেই জানি যে, জাতীয় রাজনৈতিকরা নিজেদেরকে যতটুকু ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবী করেন, তাদের হাতে আদতে ততটুকু ক্ষমটা থাকে না। এই সত্যটা জানার কারণেই-জাতীয় রাজনীতি ও বৈশ্বিক সমাজে সামঞ্জস্যবিধানের কাজ করতে গিয়েই উল্লেখযোগ্যভাবে জনগণতন্ত্রবাদের (populism) জন্ম হচ্ছে।

পিকে: বৈশ্বিক পটপরিবর্তন ও অসমতাসমূহের সাথে জাতীয় রাজনীতির যে সংযোগহীনতা বিদ্যমান সেটা ভেঙ্গে দেওয়ার কোন উপায় আছে কি?

এজি: হ্যাঁ, কোন না কোন উপায় তো অবশ্যই থাকতে হবে। এবং ইউরোপকে[১] নিয়ে আমার বইটিতে আমি কর আশ্রয়স্থলগুলোর সমস্যাকে সমন্বিতভাবে আমলে নেওয়ার এবং পশ্চিমা বিশ্বের অর্থনীতিতে বিশিল্পায়নের (Deindustrialization) গতিপথ পরিবর্তনের কৌশল খুঁজতে বলেছিলাম। যেটা করলে, অতীত থেকে ভিন্নতর রূপে হলেও পশ্চিমা অর্থনীতিগুলোতে আবাসনশিল্পের সুদিন ফিরে আসবে। এই প্রক্রিয়ার সাথে ডিজিটাল বিপ্লবের প্রক্রিয়া ওতপ্রোতভাবে জড়িত, কারণ একবার যখন টাকাকে ইলেকট্রনিক করা হয় তখন এটাকে মুহূর্তেই সারা বিশ্ব ঘুরিয়ে আনা যায়। এটা কর আশ্রয়স্থলগুলোকে সাধারণের আয়ত্তের ভেতর আনার অন্যতম উপাদান হিসেবে কাজ করছে। যাহোক, ঠিক একই কারণে অতীতের তুলনায় বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী ঘূর্ণাবর্তে ঘুরে বেড়ানো বিশাল অঙ্কের কালো টাকাকে জণগণের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখাটাও বেশি কঠিন হয়ে পড়েছে। আপনি যে খুব সহজেই আপনার বিশাল সম্পদকে বিশ্বের অপরপ্রান্তে লুকিয়ে রাখতে পারবেন অথচ কেউই কোন টুঁ শব্দটি করবে না, এমনটি ঠিক নয়। কারণ বৈশ্বিক জনমত এর বিরুদ্ধে বলে আমার মনে হয়।

কার্যকরী যে কোন ধরণের বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার ধারণাটিই এখনও পর্যন্ত অবাস্তব মনে হয়। গণতান্ত্রিক না হোক, অন্তত বিস্তৃত পরিসীমার নানা প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন, জাতিরাষ্ট্রের জোট ও আন্তর্জাতিক সংগঠন আমাদের রয়েছে, যেগুলো একসাথে মিলে বৈশ্বিক সমস্যাগুলো মোকাবেলা করার চেষ্টা করছে। প্যারিসের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক চুক্তির ফলে কী ঘটতে যাচ্ছে সেটা দেখার বিষয়: সেগুলো কি অর্থহীন হবে, নাকি নয়? এই মুহূর্তে আমরা সেটা বুঝতে পারছি না, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই এই চুক্তিগুলো অতীতের করা কাগজে কলমের যেকোন চুক্তির থেকে ভিন্ন ধরনের। আপনি দেখবেন এই চুক্তিগুলো কার্যত খুবই শক্তিশালীভাবে জীবাশ্ম জ্বালানি শিল্পগোষ্ঠীর ভিত নড়িয়ে দিচ্ছে। কারণ তাদের তহবিলের মূল্যমান কমে যায়। এই মুহূর্তে কম-কার্বন নিঃসরণকারী জ্বালানি প্রযুক্তিগুলোতে আক্ষরিক অর্থেই একটা বৈশ্বিক বিপ্লব ঘটে চলেছে, অন্তত পক্ষে যেটা সফল হবার সম্ভাবনা রয়েছে। মুখ্য প্রশ্নটি হল কত ক্ষিপ্রবেগে এটা অগ্রসর হতে থাকবে? মার্ক্সের একটা বিখ্যাত উক্তি রয়েছে, "সব অনড় বস্তুই বাতাসে মিলে যায়," এবং আমরা হয়ত দেখব, কম-কার্বন নিঃসরণকারী জ্বালানি প্রযুক্তির বৈশ্বিক বিপ্লব এই নীতির একটা অনুরূপ হিসেবে মঞ্চস্থ হচ্ছে। ডিজিটাল বিপ্লব যে বিস্ময়কর গতি, সুযোগ ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে এবং তার ফলে বিশ্বায়নের প্রসারণ হয়েছে, সেটা এই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছে।

পিকে: একটি প্রসঙ্গ আপনার গবেষণায় বারবার উঠে এসেছে। সেটি হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সংঘটিত বিশ্বায়ন -সময় ও স্থানের দূরত্ব হ্রাস করেছে এবং বিশ্বায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ও সুযোগ বৃদ্ধি করেছে। আপনি কি মনে করেন-এ বিকাশ প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, কিংবা যুক্তিসঙ্গতভাবে কোনো গঠনমূলক পন্থায় "বিশ্বায়নের অপ্রতিরোধ্য রথে সওয়ার" হওয়া সম্ভব? না কি আমাদের শুধুই "গড্ডালিকা প্রবাহে (go with it)" গা ভাসাতে হবে এবং পরে কী ঘটে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে?

এজি: ইন্টারনেট একটি অসামান্য ঘটনা যদি আমরা ইন্টারনেটকে

>>

তার প্রভাবসমূহের পরিভাষায় বিবেচনা করি। আমরা যা অনুমান করে এসেছি, তার সবকিছুর চেয়ে এটি সত্যিই অনেক বৈশ্বিক। এটি ব্যক্তির ও বিশ্বের মধ্যকার অন্তরঙ্গতার সংযোগ সাধন করে। তারপরও যথাথভাবে উপলব্ধি করলে দেখা যায়, এটি ডিজিটাল বিপ্লবের কেবল একটি উপাদানমাত্র। অন্য উপাদানগুলো হলো সুপার কম্পিউটার ও রোবোটিক্স। আমি দেখলাম, সুপার কম্পিউটার হল যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। আপনার পকেটের স্মার্টফোনটি কয়েক দশক আগের একটি সুপার কম্পিউটারের চেয়ে অনেক ক্ষমতাশালী। এই বিশাল গাণিতিক ক্ষমতা (algorithmic power) এক মামুলি ব্যবহারকারীর কাছে যেমন সহজলভ্য, তেমনি বিভিন্ন সংস্থা, শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের কাছেও সহজলভ্য। বিশ্ব সমাজের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্র প্রভাবিত ও রূপান্তরিত হচ্ছে। তথাপি বিশ্বের কয়েকটি দরিদ্রতম সমাজে ব্যাপকভাবে স্মার্টফোন ছড়িয়ে পড়ায় বর্তমান বিশ্বে প্রায় সবকিছুই সবার কাছে সহজলভ্য। যেসব অভিবাসীরা উপদ্রুপ এলাকা ছেড়ে অন্য নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিচ্ছে, তাদের মধ্যে অনেকে স্মার্টফোন ও জিপিএস ব্যবহার করে তাদের কাঙ্ক্ষিত যাত্রাপথে পৌঁছান। এটি হলো একুশ শতকীয় অভিবাসন প্রক্রিয়া। যেভাবে আইএস হলো মধ্যযুগীয় পর্যায়ের সহিংসতা এবং ডিজিটাল প্রযুক্তিতে দক্ষতার সংমিশ্রণে সৃষ্ট একুশ শতকীয় সন্ত্রাসবাদ।

অনেকে মনে করেন, ডিজিটাল বিপ্লব একটি অসম বিশ্বের সৃষ্টি করছে। তবে অনেক সময় আপাত-সামরিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে অধিকাংশ উদ্ভাবনকে পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছিল। ইন্টারনেট ক্ষণস্থায়ী বস্তু হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, কিন্তু ইন্টারনেটের একটি বাস্তব রূপ আছে সমুদ্রের নিচে ক্যাবল আকারে ও আকাশে অবস্থিত স্যাটেলাইটে-রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র ক্ষমতা যেগুলোর চূড়ান্ত নিশ্চয়তা দেয়। তাই আমার কাছে ভৌগোলিক রাজনীতির পুনরুত্থানের বিষয়টি অন্য কোনো জিনিসের পুনরুত্থানের মতো আশ্চর্যজনক মনে হয় না। বৃহদাকার কর্পোরেশনগুলো এবং বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞাপনগুলো এখানে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। এটি একটি নতুন বৈশ্বিক অবস্থা। যে পরিবর্তনগুলো আমাদের উপর বেশি প্রভাব বিস্তার করে। তাদের মধ্যে অনেকগুলোই রাজনৈতিক মধ্যস্থতার মাধ্যমে আসেনি, বরং রাষ্ট্র ক্ষমতা নয় তো বৃহদাকার কর্পোরেশনগুলোর মধ্যস্থতায় এসেছে। কেউই এমন পৃথিবী চায়নি যেখানে পর্নোগ্রাফি অবাধে সহজলভ্য হবে, "অবাধে" শব্দটির উভয় অর্থ বিবেচনা করে তা বলা যায়। এটি ক্ষতিকর হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। আমরা এই সম্বন্ধে কিছু জানি না কারণ এই ব্যাপারগুলো একদম নতুন।

পিকে: চলুন বর্তমান সময়ের রাজনীতি নিয়ে কিছু কথা বলি। আপনি কি বর্তমানে বামপন্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে তেমন কোনো গঠনমূলক বিতর্ক চলছে বলে দেখতে পাচ্ছেন?

এজি: আমাদেরকে মধ্যপন্থী বামধারার একটি নতুন সংস্করণ তৈরির প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং তা প্রয়োগ করতে হবে। এই ধারাটি উদ্ভূত হবে সমাজতাত্ত্বিকভাবে বৈশ্বিক সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের ভেতর থেকে এবং কেবলই উল্লিখিত প্রাত্যহিক জীবনের পরিবর্তন থেকে। সেই সময় গুরুত্বপূর্ণ যে পরিবর্তনগুলো আমাদের জীবনকে রূপান্তরিত করেছিল, সেগুলোর বিশ্লেষণ থেকেই তৃতীয় পন্থা সম্পর্কিত বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল। আমাদেরকে এখন একই চর্চার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। বিশ্বের বড় বড় পরিবর্তনগুলোর দিকে আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, দেখতে হবে কেউ রাজনৈতিকভাবে ওই পরিবর্তনগুলো থেকে কী কোন ধরনের আকর্ষণ পেতে পারে এবং সেগুলো সামাজিক ও বহুজাতিক রাজনৈতিক কাঠামোর ভেতর কীভাবে সমন্বয় সাধন করে। জেরেমি করবিনের আগমনের মধ্য দিয়ে লেবার পার্টির ভেতর যা ঘটেছে, সেটিকে আমার কাছে হাইব্রিড মনে হয়েছে-এখানে একটি ডিজিটাল তরুণ প্রজন্ম সরাসরি জড়িত হয়েছে, তবে দলটির কিছু চিন্তাধারা সেকেলে।

বামপন্থীদের ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হতে হবে। আমরা এখন তৃতীয় পন্থা সংক্রান্ত বিতর্কের সময় পার করে এসেছি এবং এখন জরুরিভাবে নতুন ধারণার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আমি এই ধারণার সাথে একমত নই যে, সবকিছু কোন না কোন ভাবে ভেঙ্গে পড়বে-আমি মনে করি না ধারণাটি সত্য। আপনাকে এখনো ক্ষমতার রাজনীতিকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে, এখনো বড় বড় বিষয়গুলোকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে, এই যেমন, বৈশ্বিক কর্পোরেশনগুলোর প্রেক্ষাপটে আমরা কীভাবে অধিকতর সাম্যবাদী সমাজ লাভ করতে পারি। আমরা কীভাবে কর আশ্রয়স্থলে (tax havens) জমাকৃত অসৎ উপায়ে অর্জিত মুনাফা পুনরুদ্ধার করতে পারি? সুতরাং ক্ষমতার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা এবং তার ফলে দেশগুলোর অভ্যন্তরে ও ইইউ-এর অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক রাজনীতির উপরও অনেক কিছু নির্ভর করে।

পিকে: এখন আমি আমার শেষ প্রশ্নে চলে এসেছি। অন্যদের তুলনায় আপনি শিক্ষায়তন থেকে সফলতার সাথে আনুষ্ঠানিক রাজনীতিতে এসেছেন। আমি আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাচ্ছি রাজনীতির ময়দানে একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে আপনি নিজেকে কীভাবে দেখেন? আরো জানতে চাই, যেসব সমাজবিজ্ঞানী তাদের কাজে রাজনৈতিক আকর্ষণ নিশ্চিত করতে চান, যারা রাজনীতিতে চলমান বিষয়গুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়কে প্রভাবিত করতে আগ্রহী, তাদের প্রতি আপনার কোনো ব্যক্তিগত পরামর্শ আছে কি?

এজি: আচ্ছা, আমি রাজনীতিতে আছি কিন্তু আমি রাজনীতির লোক নই। আমি একজন একাডেমিক এবং একজন একাডেমিক হিসেবেই আছি। আমার সবচেয়ে প্রিয় প্রতিবেশ হলো বিশ্ববিদ্যালয় কারণ এখানে আমি সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। আর যেহেতু আমি জোর দিয়ে বলতে চেয়েছি, সেহেতু রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের অনেক কিছুই ধারণা ও প্রায়োগিক গবেষণার উপর নির্ভর করে। কোনো একাডেমিকের রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যাগুলোর একটি হলো আপনি আপনার উভয় কর্মক্ষেত্রের সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলবেন। একাডেমিকদের কাছে মনে হবে আপনি আপনার একাডেমিক বস্তুনিষ্ঠতার সাথে প্রতারণা করেছেন, আর রাজনীতিবিদদের মতানুসারে প্রতিদিনকার রাজনৈতিক জীবনের চাহিদাগুলোর ব্যাপারে আপনি কোনো ধারণা রাখেন না। আপনি খুব সহজে দুটো জগতের মাঝখানে আটকা পড়ে যেতে পারেন।

একাডেমি ও রাজনৈতিক জীবন অনেক আলাদা এবং খুব বেশি মানুষ এই দুটোকে সংযুক্ত করতে চান না। বড় বড় গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো একাডেমি ও রাজনীতির মধ্যে মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পন্ন গবেষণার উপর প্রচণ্ডভাবে নির্ভর করে। তারা একাডেমিক গবেষণাকে বাস্তবের নীতিমালা সংক্রান্ত প্রস্তাবনায় রূপ দেওয়ার কাজে নিয়োজিত থাকে। আর একাডেমিকরা স্বাভাবিকভাবে গণমাধ্যমের সাথে যতটুকু যোগাযোগ রাখে তারা তা থেকে বেশি পরিমানে গণমাধ্যম ঘনিষ্ঠ। এমন নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলো বর্তমানের সরকারের সাথে, অথবা রাজনৈতিক কুশীলবদের আরো বিস্তৃত চক্রের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। আমি বলছি না এটিই একমাত্র পথ। তবে ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে আমি যখন রাজনীতিতে একটু বেশি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, তখন ইনস্টিটিউট ফর পাবলিক পলিসি রিসার্চ (আইপিপিআর)-এর শরণাপন্ন হয়েছিলাম। আমার পরিচিত দুই-একজন একাডেমিক সেই সংস্থার সাথে তখন জড়িত ছিলেন। আমি উপলব্ধি করলাম সেখান থেকে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের মানুষের সাথে একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশের সাথে আইপিপিআর ও তার চারপাশের বিস্তৃত নেটওয়ার্কের ভালো সংযোগ আছে। আমি কখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কারো রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলাম না, এবং নিজেকে প্রথমত একজন একাডেমিক হিসেবে দেখে এসেছি। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
Anthony Giddens <Ax.Giddens@lse.ac.uk>
ও Peter Kolarz <kolarz.peter@gmail.com>

[১]Giddens, A. (2014) Turbulent and Mighty Continent (second edition). Cambridge: Polity.

> গ্রিস:
একটি ভূ-রাজনৈতিক ইতিহাস ও দেউলিয়াপনা

ভ্যাসিলিস কে. ফুওসকাস, ইস্ট লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, ইউকে

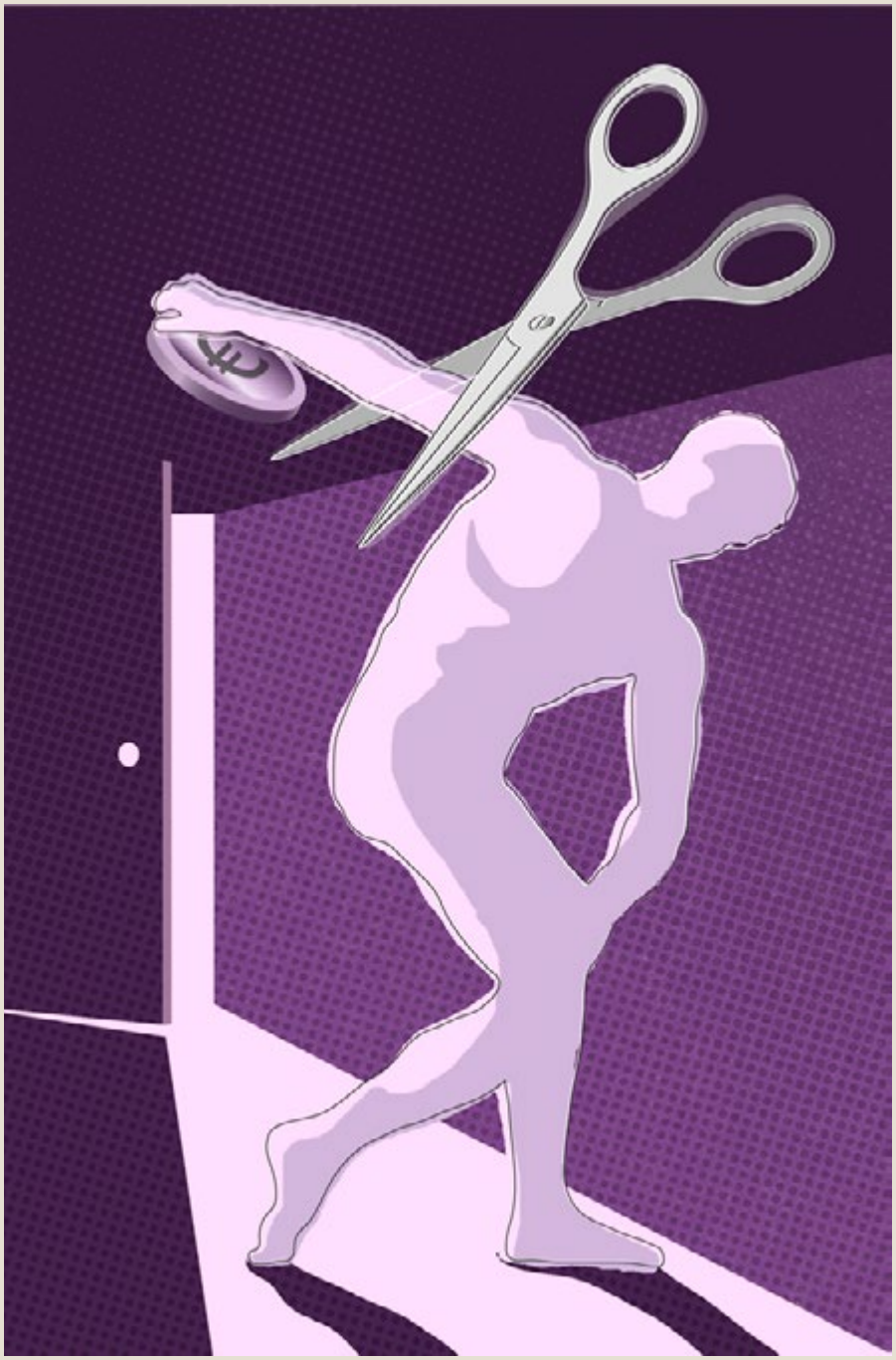

দেউলিয়াপনা ব্যাখ্যা গ্রিসের ইতিহাসকে আরো মূর্ত করে তোলে। প্রতিমূর্তি: আরবু

পেলপনিস, দক্ষিণ রুমেলিয়া, ইউবোয়া ও সাইক্লেডস দ্বীপপুঞ্জ বেষ্টিত বলকান অঞ্চলের দক্ষিণ কোণে অবস্থিত গ্রিক রাষ্ট্রটি ১৮৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত। গ্রিক রাষ্ট্রটি অর্থনৈতিক বিবর্তনের মাধ্যমে বিকশিত শিল্পপতি শ্রেণির সংগ্রামের ফসল নয়। এটি তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদীদের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থে সংঘটিত আকস্মিক ঘটনার ফসল। যা গ্রিসের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানকে এমন গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। প্রুসিয়ার জানকার্স অথবা ইতালির পিয়েদমন্ত-এর আদলে শিল্পকারখানার মালিকদের তত্ত্বাবধানে সংগঠিত জাতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে সামান্ত্রতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে ধ্বংসের মাধ্যমে এই রাষ্ট্রের জন্ম নয়, বরং এর উত্থান পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর ভূ-রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা মেটানো। উল্লেখ্য, এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র ছিল পূর্ব-ভূমধ্যসাগরে রাশিয়া ও মিশরের সম্প্রসারণমূলক নীতিকে বাধাগ্রস্ত করা। তাই বলা যায় গ্রিস প্রতিষ্ঠার প্রধানতম কারণ ছিল ভু-রাজনৈতিক। আর সে কারণেই বর্তমান প্রেক্ষাপটে গ্রিসের ঋণ সঙ্কটের ঐতিহাসিক উৎপত্তি বুঝতে হলে ভূ-রাজনৈতিক প্রশ্ন বোঝার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কেননা গ্রিস রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পশ্চিমা শক্তিগুলো গ্রিসের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানকে নিজেদের সুবিধার জন্য ব্যাবহার করেছে, গ্রিক জনগণের ও সমাজের কল্যাণের জন্য নয়।

> উনিশ শতকে আন্তর্জাতিক পুঁজির বন্ধন

অটোম্যানদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধের

>>

সময় গ্রিক অভিজাতরা পশ্চিমা শক্তিগুলোর কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ আর্থিক সুবিধা নিয়েছিল । ১৮২০ সালে গ্রিস আটলক্ষ ও বিশ লক্ষ সমপরিমাণ অর্থের দুইটি বড় ঋণ গ্রহণ করেছিল। আর সেই অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়ে, ১৮২৪-২৫ সালে গ্রিস রাষ্ট্র প্রথমবারের মত দেউলিয়া অবস্থা পার করে। কেননা এই সময়ে সে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড সরকারের কাছে থেকে নেয়া ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়। ১৮৩২-৩৩ সালে গ্রিস আরও একবার ৬০ লক্ষ ফ্রাঁ ঋণ নেয়। এই পুরো অর্থ সেনাবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণের কাজে খরচ করা হয়। এই ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে, ১৮৪৩ সালে গ্রিস পুনরায় দেউলিয়া অবস্থার শিকার হয়।

১৮২৭ এবং ১৮৭৭-৭৮ সালে গ্রিস পশ্চিমা অর্থ বাজারের বাইরে ছিল। এই পাঁচ দশকে ও তৎপরবর্তী সময়ে সরকার অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে ঋণ নিয়েছিল। এই সময় অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অটোম্যান সাম্রাজ্যের সময় থেকে প্রচলিত নীতি মেনে ধনী অভিবাসী, গ্রিক ইহুদি ও আর্মেনীয় বণিকদেরকে পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহ দিয়েছিল। গ্রিসের অর্থনীতি চাঙ্গা করার পথে প্রধান অন্তরায় ছিল শিল্পে অনগ্রসরতা এবং আয়তনের সীমাবদ্ধতা। যার ফলে উনিশ শতক জুড়ে গ্রিস সবসময়ই প্রান্তিক অর্থনীতি নির্ভর রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায়, গ্রিস ১৮৯৩ সালে পুনরায় দেউলিয়াত্বের মুখোমুখি হয়েছিল।

দুর্বল অর্থব্যবস্থা, ব্যাংকিং খাতে অনগ্রসরতা ও শিল্প খাতে আশানুরূপ বিকাশের অভাব থাকলেও গ্রিস সবসময় পশ্চিমা শক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের জন্য। যা আসলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর স্বার্থ রক্ষার জন্যই হয়েছে। কেননা অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয় ও অটোম্যানদের পতনের পর যে, সদ্য দখলমুক্ত নয়া এলাকার অধিকার নেওয়ার জন্য একদিকে রাশিয়া ও অন্যদিকে পশ্চিম ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইতালি ও জার্মানি অগ্রসর হতে থাকে। এই সময় বল্কান অঞ্চলের ক্ষুদ্র খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলো অটোম্যানদের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে পশ্চিমা শক্তিগুলোকে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে অটোম্যানদের ইউরোপের বাইরে নির্বাসিত করা হয় এবং বল্কান তথা পূর্ব ইউরোপ, নিকট প্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের সীমানা নতুন করে নির্ধারণ করা হয়।

জমি অধিগ্রহণ ও জনসংখ্যার একত্রীকরণই গ্রিস নয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে উদার জাতীয়তাবাদী এলেফথেরিওস ভেনিজেলসের পরিচালনায় গ্রিস উল্লেখযোগ্য শিল্পোন্নতি লাভ করে। কিন্তু ব্রিটিশ মদদে ভরসা করে ভেনিজেলস এশিয়া মাইনরে কামালপন্থী জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে এক অসম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। এই যুদ্ধের ফলাফল গ্রিস ও আধুনিক তুরস্কের জন্য ভয়াবহ হয়েছিল। এই সময়ে গ্রিস প্রায় ১৪ লাখ খ্রিস্টান শরণার্থীকে আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়। ফলে, ইতিহাসে প্রথমবারের মত গ্রিস জাতিগত সমসত্তা অর্জন করে। অন্যদিকে তুরস্ক তার সব থেকে উদ্যোগী বণিক শ্রেণি হারিয়েছিল। কেননা তারা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন মডেলের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত জাতিগত ও ধর্মীয় সমসত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

একটি শক্ত সামর্থ্য অর্থনীতির অভাবে এবং অভিজাত শ্রেণির সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আনুগত্যের কারণে, গ্রিস তার ভূ-রাজনৈতিক কৌশলগত অবস্থান পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। ফলে গ্রিসের কৌশলগত অবস্থান সম্পদ নয় বরং একটি স্থায়ী দায় হিসেবেই দেখা দেয়। এর প্রভাব সরাসরি বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যের উপর পড়ে। দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক সমর্থন ত্বরান্বিত করতে ঋণের প্রয়োজনী য়তা অপরিহার্য করে তোলে। একটি দুর্নীতিগ্রস্থ রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে নিয়মিত ঋণের প্রভাব বজায় থাকে।

> ১৯২৯'র অর্থনৈতিক সঙ্কট ও পরবর্তী অবস্থা

১৯২৯ সাল নাগাদ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়। ১৯৩২ সাল নাগাদ গ্রিস চতুর্থ বারের মত দেউলিয়া ঘোষিত হয়। অবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য, গ্রিসের তৎকালীন একনায়ক ইয়োয়েন মেতাকাজ আমদানিমুখি শিল্পায়ন নীতি গ্রহণ করেছিলেন। সমসাময়িক সময়ে, বিশ্বপরিমণ্ডলে ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তনের ফলে আমেরিকার উত্থান ও শীতল যুদ্ধের সূচনা গ্রিসের জন্য লাভজনক ছিল। পুঁজিবাদের স্বর্ণযুগে গ্রিসের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় আমেরিকান বিনিয়োগকারীরা বিপুল পরিমাণ অর্থ সাহায্য হিসেবে ও পুঁজি আকারে বিনিয়োগ করেছিল। এই নগদ অর্থ আগমন দেশের ভেতরের সমাজতন্ত্রীদের কোণঠাসা করে ফেলে।

এতকিছুর পরেও গ্রিস গভীরভাবে নির্ভরশীল প্রান্তিক অর্থনীতি হিসেবেই থেকে যায়। যেমন, ১৯৬০ সালে গ্রিসের কেন্দ্রিয় ব্যাংকের গভর্নর যেনফোন যলোটাস, এথেন্সে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কাছে ঋণ চাইতে যান। যুক্তি হিসেবে তিনি গ্রিসের ভূ-রাজনৈতিক সঙ্ঘাতের উদাহারণ টেনেছিলেন। রাষ্ট্রদূত প্রতি-উত্তরে বলেছিলেন যদি গ্রিস ঋণ পেতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই ডেন আচিসন-এর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ন্যাটোর ভেতরে গোপন আলোচনার ভিত্তিতে এই পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছিল। এই পরিকল্পনায় তুরস্ক ও গ্রিসের মধ্যে সাইপ্রাস বিভক্তির কথা বলা হয়েছিল। মূলত সাইপ্রাসের নির্বাচিত নেতা আর্চবিশপ মেকারিওস ও তুরস্কের মধ্যে এই ভাগাভাগির কথা হয়েছিল। উল্লেখ্য মেকারিওস ছিলেন জোট নিরেপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এভাবেই ঐ অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে, ঋণ প্রদান বা এমন বিনিয়োগ প্রভাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ন্যাটো ও পশ্চিমা দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষার জন্য সিআইএ-এর সহায়তায় গ্রিসে সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, এবং ১৯৭৪ সালে সাইপ্রাসের বিভক্তির পরেই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল।

১৯৫০-১৯৭০ সাল পর্যন্ত গ্রিস পশ্চিমা নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয়নি। এই সময়ে সে পশ্চিমা চাহিদানুযায়ী কেইনসিয়ান নীতির পরিবর্তে যে নীতি গ্রহণ করেছিল তা পরবর্তীকালে নব্যউদারতাবাদ হিসেবেই নামকরণ করা হয়। মূলত শীতল যুদ্ধের প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতি ছিল সরবারহ নির্ভর ও উত্তরাধুনিক। যদিও সোভিয়েতপন্থীরা ১৯৪৪-৪৯-এর গৃহযুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল তবুও সমাজে তাদের পক্ষে জনসমর্থন ছিল অনেক বেশি। ফলে রক্ষণশীল রাজনৈতিক গোষ্ঠী গ্রিসে যেকোন উদারনীতির বিরুদ্ধে ছিল। আর এই কারণেই রাজনৈতিক অংশগ্রহণে নানা বাধা তৈরি করা হয় এবং ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত চাহিদা নির্ভর অর্থনীতি স্থগিত রাখা হয়।

কিন্তু ১৯৭৪ সালের পরে ডানপন্থী কন্সতান্তাইন কারমানলিসের (১৯৭৪-৮১) ও সমাজতান্ত্রিক আন্দ্রিয়াজ জি পাপান্দেওন (১৯৮১-৮৯; ১৯৯৩-৯৬)-এর পরিচালনায় গ্রিসের রাষ্ট্র কাঠামোর নীতি নির্ধারণে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। এই সময় চাহিদার সাথে মিল রেখে কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারনা জোরদার হয়। কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও নেয়া হয়। প্রধান প্রধান বেসরকারি শিল্পকারখানাগুলোকে সরকারিকরণ করা হয়, এবং কল্যাণ রাষ্ট্রের অর্থায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ খাত থেকে কর ও আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ঋণের সংস্থান করা হয়। এমনকি ১৯৮১ সালে গ্রিস যখন ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিউনিটির (ইইসি) সদস্যপদ লাভ করে তখনও পশ্চিমা নব্যউদারনীতির পরিবর্তে চাহিদা নির্ভর অর্থনৈতিক নীতি অব্যাহত রেখেছিল।

এই পুরো সময় জুড়ে গ্রিসের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবেই বিবেচিত হয়েছিল। তার প্রমাণ মেলে যখন পর্তুগাল ও স্পেনের, ইইসি-এর সদস্যপদ প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বেই গ্রিস সদস্যপদ লাভ করেছিল। আসলে এই সময়ে ন্যাটো দক্ষিণ সীমান্তে স্থিতিশীলতা চেয়েছিল এবং ধারণা করেছিল যে, গ্রিস এতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে সমসাময়িক সময়ে গ্রিসে আমেরিকান বিনিয়োগ কমে আসতে থাকে। ১৯৮০ সালের দিকে ফ্রান্স ও জার্মানির পুঁজি গ্রিসের অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় চলে আসে। এই নয়া পুঁজি গ্রিসকে নব্যউদার নীতি গ্রহণে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে, যাতে করে গ্রিসের মাধ্যমে তারা বল্কান অঞ্চলে সেবা খাতের প্রসার ঘটাতে সক্ষম

>>

গ্রিক অর্থনীতির ধ্বস।

হয়।

> ইউরোজোনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি

দুই দশক ধরে, বিশেষ করে ২০০১ সালে ইউরোজোনে প্রবেশের পর থেকে গ্রিসের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। এই সময় গ্রিসের অন্যতম মুনাফা অর্জনকারী শিল্প যেমন বস্ত্রখাত ধ্বংস হয়ে যায়। অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং সেবাখাত গ্রিসের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে এবং তা বল্কান ও নিকট প্রাচ্যে বিস্তার লাভ করে। সরকারি সম্পত্তি নিয়মিতভাবে বেসরকারিকরণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ঋণের উপর সরকারের নির্ভরতা এমনভাবে বৃদ্ধি পায় যে, দেশ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ হারাতে থাকে, এবং বিদেশি পুঁজির প্রভাব আশঙ্কাজনক ভাবে বেড়ে যায়।

যখন বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা ইউরোজনকে আঘাত হানে তখন গ্রিস সব থেকে বেশি বিপদে পড়েছিল। কেননা গ্রিস ছিল নব্যসাম্রাজ্যবাদী আর্থিক শৃঙ্খলর সব থেকে দুর্বলতম অংশীদার। কুড়ি বছর ধরে গ্রিসের অর্থনৈতিক ঋনায়ন এবং তাকে অনুসরণ করে "বেইল আউট" চুক্তি, ঐতিহাসিকভাবে চলে আসা অর্থনৈতিক সমস্যার কোন সমাধান দিতে পারেনি। শিল্পে অনগ্রসরতা, প্রাতিষ্ঠানিক অদক্ষতা জিডিপির বেশি অধিক পরিমাণে ঋণ, ব্যাপক বাজেট ঘাটতি, ও রাজস্ব সমস্যা ছিল-এর অন্যতম কারণ।

এই অবস্থায় দরকার ছিল সরকারি বিনিয়োগ, শিল্প ও কৃষি খাতের পুনর্গঠন, যার ভিত্তি হওয়া উচিত ছিল প্রকৃতিবান্ধব শক্তি, যেমন: সৌরশক্তি। একই সময়ে একটি স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি দেশের ভূ-রাজনৈতিক কৌশলগত অবস্থানকে কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে পারত, এবং নিকট প্রাচ্য অঞ্চলে শান্তিবাদী অবস্থানকে কাজে লাগাতে পারত। আর যদি এই কাজগুলো ইউরোজোনের কাঠামোর ভেতর করা সম্ভব না হয়, তবে ধরে নিতে হবে যে, ইউরোজোনের গলদ আছে, গ্রিসের নয়। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
Vassili Fouskas <v.fouskas@uel.ac.uk>

> রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত মিতব্যয়িতানীতি গ্রিসে

মারিয়া মারকান্তোনাতোউ, এগিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রিস

রাস্তার একজন ক্রেতা কেন্দ্রীয় এথেন্সের একটি বন্ধ দোকানের সামনে থেকে কাপড়-চোপড় সংগ্রহ করছে। পেত্রোস গিয়ানাকৌরিস/এপি আলোকচিত্র

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইউরোজোনের নীতিমালা উদারনৈতিক অর্থনীতিবিদ ফ্রেডরিক হায়েকের চিন্তা ও কাজ দিয়ে প্রভাবিত হয়েছে। বিশেষ করে আর্থিক ও রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি, অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও গণতন্ত্র সম্পর্কিত বিষয়গুলো। এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে একটি স্বায়ত্বশাসিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে। যা ভিন্নধর্মী অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি সংরক্ষণবাদি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ নীতি মেনে চলে। এই নিয়ম তখনও মেনে চলা হয়েছে যখন স্বর্ণ মূল্যমান হিসেবে বিবেচিত হত, তবে অনেক সময় এই নিয়ম সমভাবে সবদেশে সুবিধাজনক হিসেবে বিবেচিত হয়নি। ইউরোজোনের বাজার কাঠামোর গলদ বৈশ্বিক সঙ্কটের সূচনালগ্ন থেকে প্রতীয়মান হয়েছে। যদিও ইউরোপীয় আত্তীকরণ প্রকল্পের সমর্থনে অনেক রাজনৈতিক শক্তিই সামাজিক কল্যাণ নীতির পক্ষে ছিলেন, তারপরেও ২০১০ সাল পরবর্তী সঙ্কটের ব্যবস্থাপনা সময়ে, বিশেষ করে গ্রিসের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে, অনেকেই সামাজিক ইউরোপের ধারণা পরাজিত হয়েছে বলেই মেনে নিয়েছেন।

২০১০ সাল থেকেই গ্রিসের উপর অর্থনৈতিক উদারীকরণ নীতি কঠোর ভাবে আরোপ করা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে বিভিন্ন দেশের বহিষ্করণের মাধ্যমে এই পদক্ষেপের সূচনা হয়েছিল। গত ছয় বছর ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক সরকার (সামাজিক গণতান্ত্রিক, ডানপন্থী, বামপন্থী, টেকনোক্রেট, অস্থায়ী ও জোট সরকার) তথাকথিত "সমঝোতার স্মারকচুক্তি"-এর আওতায় ডজনখানেক নতুন নিয়ম-নীতির প্রণয়ন করে যা গ্রিস সরকার ও তার আন্তর্জাতিক ঋণদাতাদের মধ্যে নানাবিধ চুক্তির জন্ম দেয়। সরকারি খরচ বহন, ও ঋণের কিস্তি দেয়ার জন্য যে অতিরিক্ত ঋণ সহায়তা দরকার, তার জন্য মিতব্যয়িতা নীতি বাধ্যতামূলক গ্রহণ করা হয়। তথাকথিত ব্যবসা বান্ধব নীতি প্রণয়নের নামে ব্যক্তিমালিকানা ও কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণাকে সঙ্কুচিত করা হয়। ১৯৯০ এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই কল্যাণ রাষ্ট্রের মালিকানা সঙ্কুচিত হওয়া শুরু করছিল।

প্রথম "স্মারকচুক্তি" থেকে শুরু করে তৃতীয় "স্মারকচুক্তি" পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আর্থিক নীতিমালা নতুন মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হুমকি, আর্থিক শৃঙ্খলা নীতি আরোপ, চাপ প্রয়োগ, গ্রেক্সিট (ইউরোজন থেকে গ্রিসের অপসারণ) বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভীতি দেখিয়ে নতুন আইন কার্যকর করা হয়েছে। যদিও প্রতিবাদ হিসেবে এর বিরুদ্ধে ধর্মঘট, বিক্ষোভ তীব্রতর হয়েছে এবং নতুন সামাজিক আন্দোলনে হাজার হাজার মানুষ জড়িয়ে পরেছে। রাজনৈতিক দলগুলো চুক্তির মাধ্যমে আরোপিত কর নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে।

এই কঠোর নীতির ফলে ২০১০ সাল নাগাদ গ্রিসের জিডিপি ২৭% কমে আসে এর তুলনা চলে ১৯৩০ সালের আমেরিকার জিডিপির পতনের সাথে। জীবনযাত্রার মান বহুলাংশে অবনতি ঘটেছে, মজুরি ও পেনসনের হার ২০% থেকে ৫০% পর্যন্ত কমে এসেছে, এবং জরুরি কর আরোপের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জন-

>>

সংখ্যার একটি বড় অংশ দরিদ্র হয়ে পড়েছে। সরকারি খাতে ব্যয় চরমভাবে কমানো হয়েছে। হাজার হাজার মানুষকে চাকুরি হারাতে হয়েছে। নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে গেছে। একই সাথে "ফাস্ট ট্র্যাক" পদ্ধতির মাধ্যমে সরকার রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বেসরকারিকরনের অনুমতি দিচ্ছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন স্কুল, হাসপাতাল, আশ্রয় কেন্দ্র, এমনকি এতিমখানা পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। যেগুলো টিকে আছে তারা খুব কম অনুদানে চলতে বাধ্য হচ্ছে। অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো বর্ধিত সামাজিক চাহিদা পুরণে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণমূলক খাতগুলোতে সরকারি সেবার মান চরমভাবে কমে গেছে।

২০০৬ সালে যেখানে বেকারত্বের হার ছিল প্রায় ৯%, তা ২০১৪ সালে বেড়ে দাড়ায় ২৭%। গ্রিসের শ্রমিক শ্রেণির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কোন স্বপ্নই আর অবশিষ্ট থাকেনি। অর্থনীতি যে খুব তাড়াতাড়ি চাঙ্গা হবে না, তা মোটামুটি স্পষ্ট ছিল। যেখানে গ্রিসের অর্ধেকের বেশি তরুন বেকার এবং কাজের পরিবেশ বিরূপ, সেখানে শ্রমবাজারে নতুনদের বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। পরিবারগুলো তার সন্তানদের ও বড়দের সাহায্য করতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ মজুরী ও পেনশন কমিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে গ্রিসের পরিবার কাঠামো হুমকির মুখে পড়েছে। এই পরিবার কাঠামো গ্রিসের কল্যাণ রাষ্ট্র ভাবনার অন্যতম ভিত্তি ছিল। যদিও তা উত্তর ইউরোপের মত কখনোই সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে নি। উল্লেখ্য যে, পরিবার কাঠামো অনুন্নত পুঁজিবাদের স্মারকচুক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়-এই যুক্তি ইইউ-এর স্মারকচুক্তি "আধুনিয়াকায়ন" নীতি থেকে স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয়। তাই বর্তমানে এমন কোন প্রমাণ নেই যা থেকে মন্তব্য করা যেতে পারে যে, গ্রিস ইউরোপের কল্যাণ রাষ্ট্র হওয়ার পথে এগিয়ে চলছে। ঋণদাতারা গ্রিসের পারিবারিক কাঠামো ও কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণাকে উপেক্ষা করে অর্থনৈতিক সংস্কার ও বাজার ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে অর্থনীতি পুনরদ্ধারের চেষ্টা করে যাচ্ছে। কথাটির অর্থ হচ্ছে বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তার সুযোগ শুধু তাদের জন্যই যারা এই ব্যয়ভার বহন করতে পারে।

আর এই অনিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা কোনভাবেই সামাজিক প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে অথবা ঐকমতের মাধ্যমে হয়নি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত "জরুরী পদ্ধতি" নাম দিয়ে অস্বচ্ছ উপায়ে গৃহীত হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়ায় দেশীয় অভিজাত ও পাওনাদারদের চাহিদা বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের চাপে এই সিদ্ধান্তগুলো নেয়া হয়েছে। বাস্তবে গ্রিক ভোটাররা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ইউরোজোট এবং আর্থিক ও বাণিজ্যিক সংস্থা বাস্তবে সংসদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ফলাফল ছিল, ২০১১ সালে একজন "টেকনোক্র্যাট সরকার" মনোনীত হয়, যিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েও আন্তর্জাতিক ব্যাংকের সেবা দিতেন। ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। বিদ্যমান সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য গণভোটের আশ্রয় নেয়া হয়েছিল।

কার্ল পলানির মতে, অর্থনীতির ধারণায় সমাজ ও বাজারের মধ্যে পার্থক্যের মাধ্যমে বাজারউদারতাবাদ অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়: গ্রিসে এই প্রভাব স্পষ্ট ভাবেই দেখা যাচ্ছে। এই পার্থক্য উদারীকরণের যে কাঠামো তৈরি করে তা মূলত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন গ্রিসের বাজার ব্যবস্থা হলো রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিষয় এবং এই প্রভাব "স্মারকচুক্তি" নীতিমালায় স্পষ্ট ভাবেই দেখা যায়। যা ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইতিহাসে রাজনৈতিক বলপ্রয়োগের সবচেয়ে বড় উদাহরণ।

উনিশ শতকের পুঁজিবাদ সম্পর্কিত মতবাদে পলানি বলেন, উদারপন্থীরা স্বনিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থার সঙ্কটের কারণ হিসেবে একটি বিশেষ সামাজিক শ্রেণিকে দায়ী করে। একই ভাবে গ্রিসের বর্তমান সঙ্কটের কারণ হিসেবেও এই শ্রেণিকে দায়ী করা হয়। যেমন শ্রমিকেরা অধিক মজুরি পাচ্ছে, সরকারি কর্মকর্তার সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি, সামাজিক সুবিধা অনেক বেশি দেয়া হচ্ছে এবং সরকারি সম্পত্তি অনেক বেশি রাখা হয়েছে। ফলে তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা এই সকল অব্যবস্থাপনার প্রতিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সামগ্রিক কাঠামো এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে বেহিসেবি খরচ বন্ধ করে বাজার পুনরুদ্ধারের সহায়তা করা যায়। গ্রিসের এই সঙ্কট মোকাবেলা আসলে ইউরোজোনের সর্বত্র অনাড়ম্বর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করার একটি কৌশলগত উপায়। অন্যতম লক্ষণীয় বিষয় হল, অনির্বাচিত অরাজনৈতিক ইউরোপিয় প্রতিনিধিরা জাতীয় বাজেটে নজরদারি করার ক্ষমতা লাভ করেছে। কিন্তু একই সাথে সঙ্কটের সময়ে ইউরোপিয় আর্থিক সংস্থার কাঠামোগত ঘাটতি ও ভঙ্গুরতা স্পষ্ট হয়েছে। ইউরোজোনের অর্থনীতি এক প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যবাদের দিকে যাত্রা শুরু করেছে, যা চরম বামপন্থি ও নব্য নাজিদের নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারে সহায়তা করে। ইউরোপিয় একত্রীকরণের স্থলে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব-এর প্রতি সমর্থন বেড়ে যাচ্ছে, যা কিছুদিন আগেও সেকেলে ধারনা বলে মনে করা হত: বৃহত্তর ইউরোপ ও রাজনৈতিক সম্মেলন প্রতীকী শব্দ হিসেবে বিবেচিত করা হয়। ইউরোজোনের অভিজাত শ্রেণি অর্থনৈতিক উদারীকরণের প্রতি আগ্রহী এবং শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ও পাবলিক বিনিয়োগের জন্য তহবিল গঠনে তেমন একটা আগ্রহী নয় যা আশংকা জনক।

শাস্তিমূলক মিতব্যয়িতা, নিয়মতান্ত্রিক আর্থিক শৃঙ্খলা নীতি ও নব্যউদারতাবাদি নীতি ও আন্ত:ইউরোপিয় উপনিবেশবাদ শ্রমিকদের জন্য অবস্থাকে কঠিন করে তুলেছে এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রনহীনতা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করেছে। যতদিন কোন বিশ্বাসযোগ্য পরিকল্পনা মিতব্যয়িতার জন্য যথার্থ ভাবে অনুসরণ না করা হচ্ছে, ততদিন জাতীয় অর্থনীতির সঙ্কট ও শ্রেণি বৈষম্য বাড়তেই থাকবে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধারণার জন্ম হবে যে, জন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের এড়িয়ে গিয়ে অন্য জায়গায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে। কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অভিজাতদের কারণে মানুষের মধ্যে বিশ্বায়ন বিরোধী ও ইউরোজন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মতবাদগুলো মানুষকে আকৃষ্ট করছে। প্রশ্ন হল যে, কোন রাজনৈতিক কাঠামো এই যুক্তিকে গ্রহণ করবে এবং কোন সামাজিক শক্তি নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। যারা নব্যউদারতাবাদের সাথে সম্পর্ক ছেড়ে গণতন্ত্র-এর কথা বলছে তারা কি টিকে থাকবে? নাকি ইউরোপের কট্টর ডানপন্থীরা জাতীয়তাবাদী মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে? পলানির "ডাবল মুভমেন্ট"-এর আলোকে বলা যায়, বাজার ও তার রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা বিজয়ী হিসেবে আবির্ভূত হবে, যার ফলে গণতন্ত্র বাধাগ্রস্থ হবে এবং ভবিষ্যৎ গভীর অন্ধকারে ঢাকা পড়বে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
Maria Markantonatou <mmarkant@soc.aegean.gr>

> সিরিযা: পরাভব থেকে বাস্তববাদিতায়

জন মিলিওস, ন্যাশনাল টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অফ এথেন্স, গ্রিস

এথেন্সে সিরিযা বিক্ষোভ।

সিরিযা (SYRIZA) ২০০৪ সালে দশটিরও বেশি বামপন্থী রাজনৈতিক দল নিয়ে ঢিলেঢালাভাবে জোট হিসেবে যাত্রা শুরু করে। এই জোটটি গঠনের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল ২০০০ সালে যখন, সিরিযা গঠনকারী অধিকাংশ রাজনৈতিক গোষ্ঠী একসাথে মিলে গ্রিক ও ইউরোপিয় "বিশ্বায়ন বন্ধ কর" আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। ২০০১ সালে হাজারে হাজারে বামপন্থী কর্মী জেনোয়ায় অনুষ্ঠিত জি-৮ সম্মেলন বিরোধী বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিল। সম্ভবত এটি ছিল ইউরোপের স্মরণকালের সবচেয়ে বড় বিশ্বায়ন বিরোধী বিক্ষোভ সমাবেশ। এসব হাজার হাজার বামপন্থী কর্মীর অধিকাংশ এসেছিল পরবর্তীতে সিরিযা গঠনকারী রাজনৈতিক সংগঠনগুলো থেকে। গ্রিক পার্লামেন্ট ও রাজনৈতিক নাট্যমঞ্চে সিরিযার উদয় হয়েছিল একটি শক্ত বাম জোট হিসেবে।

>>

ঐতিহাসিকভাবে, সিরিযার জন্ম হয়েছে চারটি ভিন্ন রাজনৈতিক ধারার সম্মিলনে: এদের একটি হল কমিউনিস্ট ধারা (সাবেক সোভিয়েতপন্থী ও ইউরো-কমিউনিস্ট পন্থী গোষ্ঠীর ভেতর বিরাজমান উত্তেজনা থেকে); পার্লামেন্টের বাইরে অবস্থানকারী একটি বাম ধারা (প্রধানত ট্রটস্কিবাদী, মাওবাদী ও মৌলবাদী ইউরো-কমিউনিস্ট উপধারার ভেতর বিদ্যমান চাপা উত্তেজনা এ ধারাটিতে লক্ষণীয়); একটি ধারা হল, ২০০০-এর দশকের শুরুর দিককার "বিশ্বায়ন বিরোধীরা"; এবং গ্রিসের সংস্কারপন্থী সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী ধারাটি যারা মূলত ২০১২ সালের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের পরে উদিত হয়েছে, তখন গ্রিসের সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী দলটি (প্যানহেলেনিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বা "পাসোক") ভেঙ্গে যায়। ২০০৯ এর নির্বাচনে মাত্র ৪.৬% ভোট পেলেও ২০১২ সালে গিয়ে সিরিযা প্রায় ২৭% ভোট পেতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে পাসোকের (PASOK) জনপ্রিয়তা তলানিতে গিয়ে ঠেকল। কারণ ২০০৯ সালে তারা প্রায় ৪৪% ভোট পেলেও ২০১২ সালে এসে তাদের কপালে জোটে মাত্র ১৩.৮% ভোট। ১৯৭৪-এর সামরিক শাসনের অবসানের পর থেকে "পাসোক" পালা করে "নিয়া ডেমোক্রাশিয়া"র সাথে ক্ষমতা বদল করে আসছিল, কিন্তু ২০১৫ সালের নির্বাচনে পাসোক মাত্র ৪.৬% ভোট পেয়ে ধ্বসে পড়েছিল। যেখানে প্রায় ৩৬%-এরও অধিক ভোট পেয়ে সিরিযা সরকার গঠন করেছিল।

সিরিযা ধারাবাহিকভাবে পালটে যেতে থাকল। ২০১২ সালে সিরিযা দেশটির প্রধান বিরোধী দলে পরিণত হবার পর থেকে ক্রমান্বয়ে সংস্কারবাদী অবস্থান নিতে শুরু করে, "বাস্তববাদিতা"র দিকে ঝুকে পড়ে এবং ৪% এর পুরনো সিরিযা-এর থেকে ২৭%-এর নব্য সিরিযা স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। আর এই সময়ের মধ্যে পাসোকের সদস্যরাও সিরিযায় যোগ দেয়। ২০১৪ সালের ইউরোপিয় পার্লামেন্ট নির্বাচনে সিরিযা ২৬.৫% ভোট পেয়ে নেতৃত্বের অবস্থানে চলে আসে এবং আসন্ন জাতীয় নির্বাচনসমূহে নেতৃত্বদানকারী দল হিসেবে সরকার গঠনের জন্য তাদেরকে প্রস্তুত বলে প্রতিভাত হতে থাকে। দলের সদস্যদের কাছে "নির্বাচনী জয়কে সুরক্ষিত" ও "কার্যকর" করার মিনতি জানিয়ে সিরিযার অনেক নেতাই মধ্যপন্থী-বাম রাজনীতিবিদ ও সংগঠনগুলোকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতে থাকেন।

গণমাধ্যমে ব্যবহৃত দলটির আনুষ্ঠানিক ভাষায়, স্লোগানগুলোতে, এবং পূর্ববর্তী লক্ষ্যমাত্রাগুলোতে পরিবর্তন আসতে শুরু করল। "বামপন্থী সরকার"-এর জন্য স্লোগানটি ধীরে ধীরে "জাতীয় মুক্তির সরকার" নামক একটি আত্মপ্রকাশকারী স্লোগান দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে গেল; "শ্রমিকের স্বার্থে ক্ষমতা, সম্পদ ও আয়ের পুনর্বন্টন" পরিবর্তিত হয়ে হল "দেশের উৎপাদনমুখী পুনর্গঠন"। জনগণ দ্বারা সমাজ ও অর্থনীতির গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, স্বশাসিত সমবায়মূলক উৎপাদনমুখী পরিকল্পানার উন্নয়ন এবং বাজার বহির্ভূত সামাজিক অর্থনীতি ইত্যাদি কর্মসূচিগত অবস্থানগুলোকে একপাশে সরিয়ে রাখা হল।

সিরিযার নির্বাচন পূর্ববর্তী কর্মসূচিগুলো সরকারি ব্যয় সংকোচন নীতির পরিসমাপ্তি ঘটাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং দেশটির ঋণদাতাদের সাথে গ্রিসের সরকারী খাতে বিনিয়োগের ব্যাপারে চুক্তি করবারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সিরিযা এসব প্রতিশ্রুতি থেকে সরে এসে হালকা ধরনের ইশতেহার বাস্তবায়নের মাধ্যমে আপোষ করতে চাইল এবং ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে অর্থমন্ত্রী ইয়ানিস ভারোফাকিস একটি সংসদীয় সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর করেন। ভারোফাকিস আগে কোনকালেই সিরিযার সদস্য ছিলেন না, এমনকি কোন বামপন্থী ধারার সমর্থকও ছিলেন না। তাকে মন্ত্রী করার কয়েকদিন পরেই সে প্রকাশ্যেই নিজেকে সিরিযার কর্মসূচিগত অবস্থান থেকে দূরে সরিয়ে নিলেন। তিনি সকল সামাজিক শ্রেণিকে এই সংকটের জন্য সমানভাবে দায়ী করলেন। এই সংকটের উত্তরণ হিসেবে রফতানি মুখী মডেলের দাবি জানালেন এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ নষ্ট করবে বলে মজুরি বৃদ্ধির দাবিও খারিজ করে দিলেন। তাই তাঁর প্রতিনিয়ন প্রকাশ্যে ইশতেহারের ৭০% পদক্ষেপ গ্রিসের জন্য কল্যাণকর হবে এমনটা দাবি করাটা কোন কাকতালীয় ঘটনা ছিল না।

যাহোক, সিরিযা কিন্তু এর ইশতেহারের মোট ৭০% বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসেনি। যদি তাই হত, তাহলে হয়ত সিরিযা আজকের গ্রিক সংসদীয় মানচিত্রের অন্তর্ভুক্তই হত না। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার কথা তো বাদই দিলাম। ভারোফাকিসের বিবৃতিগুলোতে যে ভিশন প্রতিফলিত হয়েছিল তা সিরিযার ইশতেহারকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছিল। বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক জোট পুনর্নির্মাণের প্রয়াস দেখা গেল-যা গ্রিসের বামধারার সরকারব্যবস্থা নিয়ে সেই সময় পর্যন্ত চলা ঐতিহাসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সমর্থন দিয়ে আসছিল।

২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারির চুক্তিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, গ্রিক সরকার তার প্রতিশ্রুতিগুলোকে নিছক ধামাচাপা দেওয়ার জন্য ইউরোপিয়ান নব্য-উদারনৈতিক ব্যয় সংকোচন কাঠামোর অভ্যন্তরে থেকে দরকষাকষি করছিল। ধামাচাপা দেওয়ার কৌশলকে এক দিকে "মানবিক সংকট দূর" করার জন্য একটি মধ্যপন্থী কার্যক্রম (হতদরিদ্রদের মাঝে জ্বালানি ভর্তুকি ও রেশন কার্ড ইত্যাদি প্রদান করার মাধ্যমে) হিসেবে দেখা যায়। অন্যদিকে এর আরেকটি অর্থ হলো, নির্দিষ্ট মৌলিক ভোগপণ্যের উপর আগে থেকে বিদ্যমান নিম্ন ভ্যাট সহগ (VAT coefficient) ও ব্যাপকহারে কর্মচ্যুতি (mass layoffs) সম্পর্কিত নির্দেশনাগুলোকে মেনে নিয়ে সরাসরি মজুরি ও পেনশন হ্রাসকরণ প্রক্রিয়াকে প্রত্যাখ্যান করা। সরকার তার নির্বাচন-পূর্ব সময়ের কার্যক্রমগুলোর উপর হাল ছেড়ে দিয়েছিল। এর পরিবর্তে নিম্ন ও মধ্যমমানের উপার্জনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যয় সংকোচনমূলক পদক্ষেপগুলোকে আরও পাশ কাটিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা করে সরকার একটি চুক্তি করতে চেয়েছিল। যার উদ্দেশ্য ছিল গ্রিসের নব্য-উদারনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো যেন অক্ষত অবস্থায় থাকে।

তারপরও ঋণদাতারা কখনোই এই প্রস্তাবগুলো মেনে নেয়নি, এর পরিবর্তে তারা নতুন মজুরি ও পেনশন হ্রাস করার কার্যক্রমসহ ("Juncker Plan") অধিকতর দুর্ভেদ্য নব্য-উদারনৈতিক নীতিমালার অধীনে গ্রিসকে অর্থ সাহায্য দেওয়ার একটি পরিকল্পনা পেশ করেছিল। আরও পাঁচ মাসের আলাপ-আলোচনার পরেও সরকার তার ঋণদাতাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুত কিস্তির কোন অর্থ পায়নি, যদিও গ্রিস তার সকল সরকারি তহবিল নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক (ইসিবি) ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর ঋণ শোধ করার প্রতিশ্রুতি পূরণ করে আসছিল। যখন গ্রিস সরকার কার্যত কপর্দকশূন্য হয়ে গিয়েছিল, তখন ২০১৫ সালের জুন মাসের শেষ দিকে সরকার জরুরি ভিত্তিতে আইএমএফ-এর প্রাপ্য অর্থ বিলম্বে পরিশোধ করেছিল। সেই সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী এ. সিপ্রাস "Juncker Plan"-এর উপর একটি গণভোট আয়োজন করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। সরকারকে গ্রিক ব্যাংকগুলো ("ব্যাংকের ছুটির দিন" ও "পুঁজি নিয়ন্ত্রণ") থেকে টাকা তোলার একটি সীমিত অঙ্ক বেঁধে দিতে হয়েছিল কারণ ব্যাংকগুলোকে আনুষঙ্গিক অর্থ ধার দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল ইসিবি। তখন উদ্বিগ্ন আমানতকারীরা তাদের সঞ্চয়কৃত অর্থ ব্যাংক থেকে তুলে নিতে শুরু করেছিল।

গণভোটের প্রচারণা অনেক দশক যাবত উপেক্ষিত শ্রেণি ও সামাজিক বিভাজনকে সবার সামনে নিয়ে এসেছিল। তখন দুই "গ্রিস" একে অন্যের সাথে লড়েছিল। এক দিকে দরিদ্র, বেতনভোগী কর্মী, কর্মহীন ও অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা "না" ভোটের দাবি জানিয়েছিল এবং অন্য দিকে উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা "হ্যাঁ" ভোটের জন্য সোচ্চার হয়েছিল। ব্যাংকগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে গণমাধ্যমের প্রচারণায় "না" ভোট দেওয়ার ভয়ানক পরিণতির কথা জানিয়ে সাবধান করা হয়েছিল, অন্যদিকে নিয়োগকর্তারা "হ্যাঁ" ভোট দেওয়ার জন্য শ্রমজীবীদের উপর চাপ প্রয়োগ করেছিল। এরপরও প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ গ্রিক (৬১.৩%) "না"ভোট দিয়েছিল। কিন্তু সরকার রক্ষণশীল বিরোধী দলের সাথে একজোট হয়ে পার্লামেন্টে এই "না" ভোটকে "হ্যাঁ" ভোটে রূপান্তরিত করেছিল। ২০১৫ সালের জুলাইয়ে সিরিযা যখন একটি নতুন ইশতেহারে স্বাক্ষর করেছিল, যেটি আদতে "Juncker Plan"-এর

>>

এলেক্সিস তিপ্রাস ইউরোপিয় অ-মিতব্যয়ীতার পক্ষ সমর্থনকারী।

একটি প্রতিলিপি হিসেবে কাজ করছিল এবং জালিয়াতির ফলাফল হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। এটি হচ্ছে গ্রিস, তার ঋণদাতা এবং গোড়া ইউরোপিয় উচ্চবিত্তদের মধ্যকার প্রতিযোগিতার পরাজয়।

এই বিশ্লেষণটি সিরিযা ও তার মতাবলম্বীদের আওয়াজের সাথে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল যারা স্মারকলিপিকে হয় একটি অর্থনৈতিক দুর্ভোগ হিসেবে গণ্য করেছিল, নয়তো এটিকে গ্রিসের উপর "বিদেশী স্বার্থান্বেষী মহল"-এর একটি আক্রমণ হিসেবে গণ্য করেছিল। এভাবে সিরিযার এই চূড়ান্ত আত্মসমর্পণকে পার্টির কিছু সদস্যরা "একটি অসম যুদ্ধে বীরোচিত পরাজয়" হিসেবে অভিহিত করেছিল। সমানভাবে তুলনা করা যায় এমন সরকার ব্যবস্থা, যেমন দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই ও রাষ্ট্র কাঠামোকে আধুনিকায়ন করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভবিষ্যতে এই পরাজয়কে মুছে ফেলা যায়। তা সত্ত্বেও, ব্যয় সংকোচন কেবল একটি "জালিয়াতি নীতি"-নয়, বরং শ্রমজীবী, কর্মহীন, পেনশনভোগী ও আর্থিকভাবে সুরক্ষিত নয় এমন মানুষদের স্বার্থের বিপরীতে পুঁজির স্বার্থকে উৎসাহিত করার একটি শ্রেণি কৌশল। এটি শ্রমের যৎসামান্য অধিকার, দুর্বল সামাজিক সুরক্ষা ও অনমনীয় নিম্ন মজুরি প্রভৃতি উপস্থাপন করে এবং কোনো অর্থপূর্ণ দরকষাকষি করার ক্ষমতা প্রদান করে না।

নির্দিষ্ট সীমার উর্ধ্বে গেলে দেখা যায়, সামাজিক জীবনের সকল উপাদানকে অবাধ বাজারের কাছে অধীনস্ত করলে তা নব্য-উদারনৈতিক ভিত্তির জন্য একটি রাজনৈতিক ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। এর কারণ হচ্ছে এটি সামাজিক প্রতিরোধের অনিয়ন্ত্রিত প্রাদুর্ভাবের জন্ম দিতে পারে। এই রাজনৈতিক ঝুঁকিটি একটি শক্ত হাতিয়ার ছিল কারণ গ্রিসের শ্রমিক শ্রেণি ও সিরিযা এই ব্যয় সংকোচন বন্ধ করতে চেয়েছিল। তবে সেই অস্ত্রটির প্রয়োগ একটি পূর্বশর্তের উপর নির্ভর করছিল। পূর্বশর্তটি হলো সিরিযাকে তার কার্যক্রমে অটল থাকতে হত এবং জনগণকে কল্যাণের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তার অগ্রাধিকারগুলোকে ধরে রাখতে হত।

তারপরও ২০১৪ সালের ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের বিজয়সূচক নির্বাচনের সময় থেকে এই কৌশলটিকে বর্জন করা হয়েছিল। "প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা"র পূর্বশর্ত হিসেবে সিরিযা তখন একটি সংস্কারবাদী নব্য-উদারনৈতিক পন্থার দিকে মোড় নিয়েছিল। কেবলমাত্র শাসক দল হিসেবে সিরিযার নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়ার মধ্যেই নয়, গ্রিসের স্টালিন-পরবর্তী সময়ের বামপন্থী রাজনীতির ঐতিহ্যের মধ্যেও সিরিযার এই মোড় পরিবর্তনের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। সরকারের কার্যবিস্তৃতিকরণ (governmentalism) প্রক্রিয়ার মধ্যে দলটির স্বদেশীয় সংশোধনবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধারণা অনুসারে রাজনৈতিক পরিবর্তনের উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত শর্ত হলো একটি বামপন্থী সরকার গঠন করা। সরকারিকরণ প্রক্রিয়ায় উৎপাদনের সম্পর্কগুলোর রূপান্তরকে অবধারিত হিসেবে ধরে নেওয়ার মাধ্যমে সামাজিক বিবর্তনকে উৎপাদনশীল লোকবলের ফলাফল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

একটি ইশতেহার স্বাক্ষর করার মাধ্যমে সিরিযা গ্রিসের প্রাতিষ্ঠানিক ও শ্রম বাজারের কাঠামোর "সংকীর্ণতা" কে দূর করার জন্য ঐকমত্যে পৌঁছেছে । যা শ্রমিকদের পূর্ববর্তী সময়ের বিজয়গুলোর প্রতিনিধিত্ব করে। গ্রিসের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সিরিযার প্রভাব এখনো বিদ্যমান। তবে আজকে সিরিযাকে প্রতিক্রিয়াশীল বামপন্থীদের একটি আন্দোলন হিসেবে বিবেচনা না করে বরং একটি মূলধারার গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীদের দল হিসেবে বিবেচনা করলে এটিকে আরো ভালোভাবে অনুধাবন করা যায়। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
John Milios <john.milios@gmail.com>

> সুফলভোগী ও ভুক্তভোগী গ্রিক অর্থনৈতিক সংকট

স্পাইরোস স্যাকলেরোপোলোস, পানতেইওন বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রিস

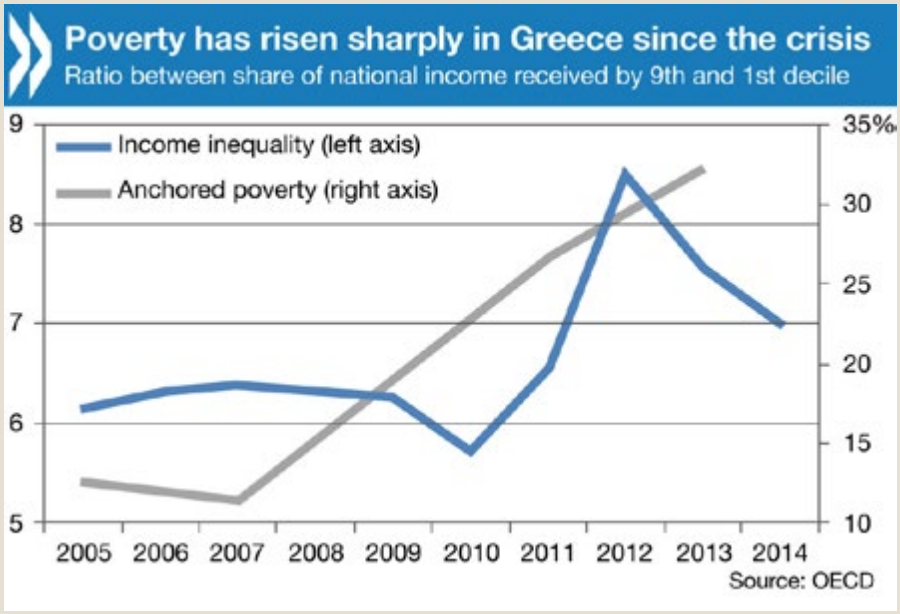

চিত্রটি গ্রিসের অর্থনৈতিক ধ্বস পরবর্তী আয়ের অসমতা ও দরিদ্রতা বৃদ্ধিকে নির্দেশ করছে।

২০১০ সালের শুরুর দিকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জর্জ পাপানড্রিউ মন্তব্য করেন যে, গ্রিস সরকারি আর্থিক অবস্থা এত শোচনীয় ছিল যে, দেশটি বিশ্ব বাজারে ধার নেবার আশা করতে পারছিলনা এবং এইভাবে দেশটি তার সরকারি ঋণ থেকে মুক্ত হবার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিলনা।

গ্রিসের প্রচলিত ধারণার বিপরীতে, দেশটির সমস্যাগুলো উচ্চ মজুরির গ্রিক শ্রমিকদের থেকে কিংবা অপব্যয়কারী রাষ্ট্রের ফলাফল থেকে আসেনি। গ্রিক মজুরি প্রচলিত স্তরের মাত্র ৮৩%, যা ১৫ ইউরোর বেশি (যারা ইউরোপিয় ইউনিয়নের ২০০৪ সালের সম্প্রসারনের পূর্ব থেকে সদস্য), যেখানে জাতীয় জিডিপির শতকরা একভাগ মাথাপিছু সরকারি ব্যয়ের ব্লকের গড় হিসেবের সমান। বরং গ্রিকের অর্থনৈতিক সংকটের উৎপত্তি হয়েছে জাতীয় শাসক শ্রেণির জাতীয় পর্যায়ে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজনের কৌশল ও সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়া থেকে। বিশেষ করে গ্রিসের ১৯৮১ সালে ইউরোপিয়ান অর্থনৈতিক জোট এবং ২০০২ সালে ইউরোপিয়ান আর্থিক সংস্থার সাথে সংযোজন। এই অবস্থাকে আরও গুরুতর করেছে, একক মুদ্রা শর্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গ্রিসের অক্ষমতাই এর জিডিপি পতনের দিকে পরিচালিত করেছে, সাথে সাথে জিডিপি অনুপাতে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে।

যাহোক, ২০১০ সালের শুরুর দিকে ফ্রান্স ও জার্মান ব্যাংকগুলোর ঋণ পরিশোধের আশায়-যাদের কাছে অধিকাংশ গ্রিস ঋণপত্রগুলো ছিল-এবং গ্রিসকে দেউলিয়াত্ব থেকে বাঁচানোর জন্য ইউরোপিয় ইউনিয়ন, ইউরোপিয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং আইএমএফ থেকে গ্রিসকে অর্থ সাহায্য দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়। কারণ গ্রিসের অর্থনৈতিক সমস্যা ইউরোপিয় ইউনিয়নের প্রধানতম সমস্যা ছিল।

কিন্তু ঋণ নেয়ার পূর্বে গ্রিস প্রথমে মিতব্যয়ি হওয়ার লক্ষে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারত। ২০১০ এবং ২০১৬ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার তিনটি স্মারকচুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। একটি মাঝারি মেয়াদী কর্মসূচি এবং আট প্যাকেজের বিশেষ ব্যবস্থা-যার মধ্যে রয়েছে (অন্যান্য পদক্ষেপের মধ্যে), সরকারি কর্মচারীদের বেতন হ্রাস করা, বয়স্কদের ভাতা কমানো, ন্যূনতম মজুরির পরিমাণ কমানো (অধিকাংশ গ্রিস কর্মীদের ৭৫১ ইউরো থেকে ৫৮৬ ইউরো, এবং যাদের বয়স ২৫ বছরের নিচে তাদের ৪৯০ ইউরো), ১৯% থেকে ২৪% থেকে কর বৃদ্ধি, আবাসন ব্যবসার ব্যাপক কর আরোপ, নমনীয় কর্মসংস্থান, সরকারি চাকরীর ব্যাপক হ্রাস, ক্রমহ্রসমান (পশ্চাদপদ) কর বৃদ্ধি, এবং আরো অনেক কিছু।

এই নীতিগুলো কতটুকু কার্যকর ছিল? শুরুর দিকে, নিরঙ্কুশ এবং আপেক্ষিক উভয়ক্ষেত্রেই সরকারি ঋণ "মূলত যে কারণে এ সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল" বেড়ে গিয়েছিল। ২০০৯ সালে ৩০০ বিলিয়ন ইউরো থেকে গ্রিসের ঋণের পরিমাণ ২০১৫ সালে ৩১৪.১৪ বিলিয়নে দাঁড়ায়;

>>

প্রকৃতপক্ষে শতকরা জিডিপি অনুসারে জাতীয় ঋণ ১২৬.৭% থেকে ১৭৯% এ আকাশচুম্বী আকার ধারণ করে। কারণ এই সময় গ্রিস অর্থনীতি সংকুচিত হয়ে পড়ে। এদিকে, বেকারত্ব ২০০৯ সালে ৯% থেকে ২০১৬ সালের মে মাসে ২৩.৫% এ উন্নীত হয়, যেখানে জিডিপি ২০০৯ সালে ২৩৭.৪ বিলিয়ন ইউরো থেকে ২০১৫ সালে ১৭৯ বিলিয়নে নেমে আসে।

এই পরিসংখ্যান গৃহীত সব ব্যবস্থার ব্যর্থতাই প্রকাশ করে। কিন্তু একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, এই নীতি একদল বিজয়ী এবং বিজিতের যে আবির্ভাব ঘটেছে তা প্রকাশ করে। বিজিত দলে রয়েছে নিচু শ্রেণি (দিনমজুর এবং ছোট ও মাঝারি কৃষি উৎপাদক)। এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমানে শুধু ১৫% বেকার বেকারত্বের সুবিধা গ্রহণ করে, সঙ্কটের আগে যেখানে ৪০% গ্রিস বেকার এই সুবিধা দাবি করতে পারত। মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারেনা এদের সংখ্যা শতকরা ১১% থেকে ২০% হয়েছে; বর্তমানে, এক মিলিয়ন গ্রিস বাস করে যাদের কেউ কোন কাজ করে না অথবা যারা চাকরি করে তারা বছরে তিন মাসের কম সময় কাজ করে। ৫০% ভাতাধারী প্রতিমাসে ৫০০ ইউরোর কম ভাতা পায়। ২০০৯ থেকে ২০১৫ সালে জাতীয় দারিদ্র্যের হার ২৭.৬% থেকে ৩৫.৭% বেড়েছে।

এমনকি যারা চাকরি করছে তারাও তাদের আয় হারিয়েছে। জিডিপিতে মজুরির অংশ হচ্ছে ৬৪ থেকে ৫৪ শতাংশ, এবং সর্বোপরি শ্রমিকেরা তাদের ক্রয়ক্ষমতার এক তৃতীয়াংশ সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। ক্রয়ক্ষমতার গড় হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ৬৫% হয়েছে। যা ইইউ ১৫ তে ছিল ৮৪%।

২০০৮ হতে ২০১৫ এর মধ্যবর্তী সময়ে ৪২৭,০০০ জন গ্রিস নাগরিক দেশত্যাগ করেছে, তাদের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডিগ্রিপ্রাপ্ত। ২০০৮ সালে গ্রিসে ৮৪৯,২৮৯ টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু ছিল যা কমে ২০১৪ তে ৬৯২,২৮৬ তে দাঁড়িয়েছে। সমাজে এমনভাবে অসমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে: যে ২০ শতাংশ ধনীলোকদের এবং ২০ শতাংশ গরিবলোকদের আয়ের অনুপাত ৫.৬/১ থেকে ৬.৬/১-তে উন্নীত হয়েছে।

জীবনযাত্রার মান কমেছে যা, গ্রিসের জনসংখ্যাতত্তে স্পষ্ট বোঝা যায়। স্বাস্থ্য খাতে খরচের ২৫% কমে গেছে। সাম্প্রতিক ২০১১ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যবর্তী যে পরিসংখ্যান বিদ্যমান তাতে দেখা যায় মৃত্যুর তুলনায় জন্মগ্রহন কম। শিশু মৃত্যুর হার ৫১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

কিন্তু লাভবান কারা? লাভবানদের অন্যতম হচ্ছে বিদেশি ব্যাংকসমূহ, যারা এই সংকটেও গ্রিসের ঋণের একটা বড় অংশ ধরে রেখেছে। জুন ২০১০, বিদেশী ব্যাংকের নিকট সরকারি এবং বেসরকারি ঋণের পরিমাণ এসে দাঁড়িয়েছে ২৫২.১ বিলিয়ন ডলার, যার মোট পরিমাণের ৭৫.১ শতাংশ; ফ্রান্স (৮৩.১ বিলিয়ন ডলার), জার্মান (৬৫.৪ বিলিয়ন ডলার) এবং যুক্তরাষ্টের (৩৬.২ বিলিয়ন ডলার) ব্যাংকের নিকট। ডিসেম্বর ২০১০ সাল নাগাদ, মোট ঋণের পরিমাণ যা বিদেশি ব্যাংকের নিকট রয়েছে তার ৪২ শতাংশ কমেছে, নিম্নগামী হয়ে যার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৪৫.৭ বিলিয়ন ডলার (যার মধ্যে ৫৬.৭ বিলিয়ন ফ্রান্সের ব্যাংকের নিকট, ৩৪ বিলিয়ন জার্মান ব্যাংকের নিকট এবং ৭.৩ বিলিয়ন আমেরিকান ব্যাংকের নিকট)। প্রথম স্মারকলিপির অধীনে, গ্রিসের ঋণপত্রের একটা বড় অংশ বিক্রি করে দিতে ব্যাংকগুলো সময় পেয়েছে- এটা একটি পদ্ধতি যা ডিসেম্বর ২০১১ তে স্পষ্ট হয়ে যায়, যেই সময়ে বিদেশি ব্যাংক গ্রিসের ঋণ থেকে তাদের প্রকাশিত অংশ হ্রাস করেছে আর এর পরিমাণ হচ্ছে ৩৫ বিলিয়ন ডলার। ২০১২ সালের নির্বাচনকালীন সময়ের মধ্যে বিদেশি ব্যাংকসমূহের নিকট গ্রিসের ঋণের বোঝা ভারমুক্ত করা হয়েছে।

গ্রিসের ভিতরে লাভবান হিসেব করলে: ২০১০ সালে দেশের সবচেয়ে লাভবান বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো ২.২ বিলিয়ন ইউরো অর্জন করেছে; ২০১৪ সালে এটা বৃদ্ধি পেয়ে ১০.২ বিলিয়ন ইউরোতে দাঁড়িয়েছে। ৩০০ টি কোম্পানি (অর্থ শাখা ব্যাতীত) তাদের সর্বাধিক বিক্রি বাবদ ২০০৯ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ৫৩.৬% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৯.৮% দাঁড়িয়েছে এবং তাদের সম্পদ ৪২.২% হতে ৪৪% উন্নীত হয়েছে।

সর্বশেষ কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল: অতিরিক্ত ৩০ মিলিয়ন ইউরোর মাধ্যমে ২০১১ সালে ৪৪৫ জন গ্রিসের নাগরিক ভাগ্যবান হয়েছে, যা সর্বমোট ৫০ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে এবং এটা জিডিপির ২৪ শতাংশ। ২০১৪ সাল নাগাদ, এই সুবিধাপ্রাপ্ত গ্রুপটি হালকাভাবে বৃদ্ধি লাভ করেছে। ৫৬৫ জন নাগরিক ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি অর্জন করেছে যার মোট পরিমাণ হচ্ছে ৭০ বিলিয়ন ইউরো যা এ বছরের জিডিপির ৩৯.৫ শতাংশ। ২০১৪ সালে এই সম্ভ্রান্তশ্রেণি ১১ জন গ্রিস বিলিনিয়ারকে তাদের দল ভুক্ত করেছে, যাদের মোট সম্পদ ১৮ বিলিয়ন ইউরো, যে সম্পদের পরিমাণ ২০১৩ সালে ছিল ১৬ বিলিয়ন ইউরো।

এই উন্নয়নসমূহ প্রতিফলিত হয়েছে দেশের সামাজিক স্তর বিন্যাসের কাঠামোতে। সাম্প্রতিক পরিচালিত এক জরিপ অনুসারে, বর্তমানে গ্রিস বুর্জুয়ারা জিডিপিতে ২.৮ শতাংশ অবদান রাখে (যা ২০০৯ সালে ছিল ৩.২ শতাংশ); গ্রামীণ ধনী ০.৬ শতাংশ (যা পূর্বে ছিল ০.৭ শতাংশ); গতানুগতিক পেটি বুর্জুয়া ৭.০ শতাংশ (যা পূর্বে ছিল ৭.৩ শতাংশ); নতুন পেটি বুর্জুয়া শ্রেণি ২১.৯ শতাংশ (যা পূর্বে ছিল ২৯.৫ শতাংশ); মধ্যবিত্ত গ্রামীণ শ্রেণি ১.২ শতাংশ (যা পূর্বে ছিল ১.৯ শতাংশ); গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণি ৭.৩ শতাংশ (যা পূর্বে ছিল ৭.৪ শতাংশ); এবং শ্রমিক শ্রেণি ৫৯.২ শতাংশ (যা পূর্বে ছিল ৪৯.১ শতাংশ)।

এই নীতির কারণ যাই হোক না কেন, এর ফলাফল একটা স্পষ্ট সামাজিক চিত্র তুলে ধরেছে। বিপুল পরিমাণ বিদেশি ব্যাংক, বিশ্ব আর্থিক সংস্থা এবং তাদের নিজ দেশের তত্ত্বাবধানে তারা তাদের নিজস্ব স্বার্থ সংরক্ষণ করেছে। ক্ষতিসমূহ কিছু খাতের অর্থনৈতিক তরলীকরণের সাথে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও দেশের আর্থিক অভিজাত শ্রেণি স্থানীয় শ্রমিক শ্রেণিকে শোষণের মাধ্যমে এবং ছোট ও মাঝারী ব্যবসায়ীদের সাথে চুক্তির মাধ্যমে তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে এবং তাদের মুনাফা বৃদ্ধি করেছে । ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
Spyros Sakellaropoulos
<sakellaropouloss@gmail.com>

> গ্রিক বেইল আউট রাষ্ট্রীয়-সাংগঠনিক অপরাধ

স্ট্রাতোস জর্জোলাস, এগিয়েন বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রিস

বেইল আউটের সুফলভোগী কারা?

সম্প্রতি আন্তজাতিক শিক্ষাবিষয়ক সংগঠনগুলি "রাষ্ট্রীয়-সাংগঠনিক অপরাধপ্রবণতা (State-corporate crime)"-কে সংজ্ঞায়িত করতে উদ্যোগী হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, অবৈধ বা সামাজিক অপকর্ম হিসাবে চিহ্নিত অপরাধসমূহ মূলত প্রশাসনের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ ও দ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্যকার বৈষম্যের ফলাফল।

রাজনৈতিক ও গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে, এই শব্দটির উৎকৃষ্ট পরিভাষা হিসাবে বহুল ব্যবহৃত শব্দটি হল, "দুর্নীতি"; তবে এক্ষেত্রে দুইটি মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রথমত, "দুর্নীতি" শব্দটিকে "অপরাধ" হিসাবে সংজ্ঞায়িত করতে চাইলে তা সর্বজনস্বীকৃত অপরাধ যেমন, মানব হত্যা, হত্যার প্রচেষ্টা, চুরি বা ডাকাতির ছাড়াও সামাজিক আচরণ বহির্ভূত কাজ যেমন জানমালের ক্ষতি, মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন কিংবা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতিকেও "অপরাধ" হিসাবে মূল্যায়ন করে; এই ধরনের সামাজিক আচরণ কে "সামাজিক ব্যাধি" হিসেবে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে সামাজিক মুল্যবোধকেই প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়। দ্বিতীয়ত, এ ধরনের সামাজিক আচরণ (সামাজিকভাবে যা অপরাধ হিসাবে গণ্য) শিকড় থেকেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী সমাজের পারস্পারিক নির্ভরতাও হতে পারে, সেটা রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদকে ব্যক্তিগত মালিকানায় রূপান্তর কিংবা রাষ্ট্রায়ত্ত সেবাকে বিশেষ নীতিমালার অন্তর্ভুক্তিকরণ- সবকিছুই পুঁজিবাদী সমাজের অংশবিশেষ।

উপরন্তু, এ ধরনের রাষ্ট্রায়ত্ত-সাংগঠনিক অপরাধসমূহ আরও কতগুলো বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। ফলে, "বৈশ্বিক অপরাধ" কথাটি বলার সময় এটি একটি ভিন্ন মাত্রাকে নির্দেশ করে। যখন আধিজাতিক (supranational) প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ) ও বিশ্বব্যাংকের মত প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণ মানুষকে বেকায়দায় ফেলেছে। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর আরোপিত নীতি (Tóp down policy) কিংবা অর্থনৈতিক কর্মসূচিগুলোও তাদের স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন করে, ফলে সাধারণ মানুষ বিশেষত উন্নয়নশীল দেশের মানুষের জীবনে এর প্রভাব হয় সুদূরপ্রসারী। যেমন, যখন "ঋণ পরিশোধের" (Debt-Repayment) মত কর্মসূচিগুলো রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্ম দেয় তখন সরকারের অভিভাবকত্ব কিংবা সরকারের প্রতি আনুগত্যবোধ সুসংগঠিত অপরাধ, দুর্নীতি, স্বৈরতন্ত্র, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন , নির্যাতন এমনকি গনহত্যার পেছনে অনুঘটকের মত কাজ করে।

গ্রিসে, যেখানে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের কার্যকারিতা নির্ভর করে সরকারী ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (আন্তর্জাতিক মহাজনদের) যৌথ সম্মতির উপর, সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সামাজিক অবক্ষয় সাধারণ ঘটনা। "Bailout Program"-এর আওতায় যেসব পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে তা জীবনযাত্রাকে সরাসরি প্রভাবিত করে, ফলাফলস্বরূপ মানবাধিকার লঙ্ঘিত হতে থাকে যাকে কী না আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিধি মোতাবেক গ্রিসের উচিত ছিল মূল্যায়ন, সংরক্ষণ এবং অনুসরণ করা। কিন্তু তা না হয়ে এই ব্যাপক অভিযোজন গ্রিসের উপর এমনভাবে আরোপিত হয়েছে যে, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং তা সামাজিক ন্যায়নীতি, সামাজিক সংযুক্তি, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে উঠেছে। কী ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে! এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে কতগুলো উদাহরণ জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

>>

কাজ করার অধিকার. গ্রিসের শ্রমবাজারের নতুন নীতি অনুসারে পুনর্গঠনের ফলে কাজের সুযোগ অনেকাংশে কমে গেছে, যা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর গুরুতর ভাঙ্গনের পেছনে উল্লেখযোগ্য কারণ। দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী যৌথ কারবারী চুক্তিগুলোর বিনাশকরণ ও শ্রম মধ্যস্থতাকারী চুক্তিসমূহ যেগুলো পূর্বে শ্রমিকদের কর্মসংস্থান চুক্তি হিসেবে কাজ করত, সেগুলো পুনরুত্থিত হয়ে শ্রম মর্যাদার মৌলিক নির্ধারক হিসেবে বিবেচিত হতে শুরু করে। ক্রমাগত মজুরি কর্তন ও উৎস করের বৃদ্ধি, কাজে অনিয়ম ও শ্রমিক ছাঁটাই (Lay-off) ও নিম্নাভিমুখী শ্রমমান ব্যাপকহারে কাজের অনিশ্চয়তা তৈরি করে এবং সেইসাথে মহিলা ও শিশু শ্রমিকদের উপস্থিতি লক্ষণীয় হারে বেড়ে যায়। কেননা তাদের শ্রম স্বল্প মজুরিতে পাওয়া যায়। বর্তমানে গ্রিসে নূন্যতম মজুরির হার এমনভাবে কমেছে যে, তা রাষ্ট্রটির দরিদ্র্যতার সীমারেখাকেও অতিক্রম করে গেছে।

জনস্বাস্থ্যের অধিকার. ২০১০ সালে প্রকাশিত "অর্থনৈতিক সমন্বয় কর্মসূচির (Economic Adjustment Program)" আওতায় জনস্বাস্থ্য খাতে জিডিপি-এর ৬% ব্যয় দেখানো হয়। ২০১২ সালে এই কর্মসূচির আওতায় হাসপাতালগুলোর পরিচালনা ব্যয় কমিয়ে ৮%-এ নামানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। হাসপাতাল ও ফার্মেসিগুলো ব্যাপক ঘাটতির সম্মুখীন হয় যখন ২০১০ সাথে বরাদ্দকৃত ৪.৩৭ বিলিয়ন পাউন্ডকে কমিয়ে ২০১৪ সালে তা মাত্র ২ বিলিয়ন পাউন্ডে রূপান্তরিত করা হয়।

শিক্ষার অধিকার. নতুন নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মিতকরণ, শিক্ষক ছাটাই, শিক্ষক বদলীকরণ (শ্রম বদলি নীতিমালা অনুসারে), শিক্ষকদের বেতন কমানো, বিদ্যালয়গুলো বন্ধকরণ বা সংযুক্তিকরণ নীতি, প্রত্যেক ক্লাসে শিক্ষার্থী সংখ্যা শ্রেণি কক্ষের ধারণক্ষমতার তুলনায় বৃদ্ধি এবং শিক্ষকদের সাপ্তাহিক কর্মঘন্টা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয় প্রবর্তিত হয়। অন্যদিকে বাজেট সংকোচনের ফলে অনেক বিদ্যালয় পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই কার্যক্রম বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার. নীতিমালা অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বর্ধিত খরচ কমানোর জন্য বয়স্কভাতা, বেকারভাতা, এবং পারিবারিক ভাতার মত সামাজিক সেবাসমূহের উপর বরাদ্দকৃত বাজেট সংকোচন করা হয়। ২০১০ সালে গড়ে প্রায় ৪০% ভাতা সংকুচিত হয়েছে যার ফলে ৪৫% বৃত্তিভোগী ব্যক্তি দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করছে।

আবাসনের অধিকার. ২০১২ সালে গ্রিসে সামাজিক আবাসন প্রকল্প বন্ধ করে দিয়ে ১,২০,০০০ পরিবারকে বাড়িভাড়া বাবদ ভর্তুকি এবং বয়স্কদের জন্য আবাসন সুবিধার প্রাধিকার দেওয়া হয়। নতুন নীতিমালা অনুযায়ী রাষ্ট্র বিচারবিভাগীয় কোন পূর্ব নির্দেশ ছাড়াই বাস্তু উচ্ছেদের এই কর্মসূচিকে সমর্থন করে। ফলে, ২০১৪ সালের মধ্যেই গ্রিসে ৫,০০,০০০-এর অধিক মানুষ গৃহহীন হয় নতুবা গৃহহীন হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদের অধিকার গৃহহীন. "ফাস্ট-ট্রাক"-এর মত কর্মসূচির আওতায় রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির একচেটিয়াভাবে ব্যক্তিমালিকানাধীকরণ (wholesale privatization of state property), রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ক্ষমতা ও বিধানসমূহকে লঙ্ঘন করে; ফলে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, জনসাধারণের সম্পত্তির অধিকার এবং সামাজিক অনুশাসন ও পরিবেশ হুমকির মুখে পড়ে।

ন্যায়বিচারের অধিকার. গ্রিসের বিচারবিভাগীয় কার্যক্রমও ঋণদাতা গোষ্ঠীর নীতিমালার আওতায় সংশোধিত হচ্ছে। বিশেষত, বিচারবিভাগীয় খরচের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি। সাধারণ মানুষের পক্ষে আদালতে আশ্রয়গ্রহণ রীতিমত দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে- বিশেষ করে, একদিকে যেমন তাদের বেতন কর্তন করা হচ্ছে; অন্যদিকে মামলার খরচ বেড়েছে।

মতামত প্রকাশের অধিকার. ২০১০ সাল থেকে আইন ও প্রশাসনিক নীতিমালার আওতায় গ্রিসের জনগণ মতপ্রকাশ ও সমাবেশের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত। স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার বাস্তবেই প্রশ্নবিদ্ধ এবং সমাবেশের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। প্রশাসন তাদের নীতিমালাবিরোধী যেকোন বৈধ আন্দোলনকে দমিয়ে রেখেছে। জনসমাবেশ বন্ধ ঘোষণা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশে জনসাধারণের উপর নিপিড়ন, পূর্ব-গ্রেফতার কর্মসূচি, সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার এবং সর্বোপরি গোল্ডেন ডাউন পার্টি প্রশাসনের সহযোগিতায় যেকোন আন্দোলন রুখতে সতর্ক পাহারা দিয়ে রাষ্ট্রের জনসাধারণকে দমিয়ে রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

বর্তমানে গ্রিসে প্রায় ২৩.১% মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করছে। ২০০৯ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে এই দারিদ্রসীমা অন্তত দ্বিগুণ হারে বেড়েছে এবং দুই-তৃতীয়াংশ জনগণ এই কঠোর নীতিমালার কারণে নিঃস্ব হতে চলছে। ২০০৯ সাল থেকে মারাত্নক বস্তুগত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে যা ১১% থেকে ২০১৪ তে বেড়ে ২১.৫%-এ এসে দাড়িয়েছে। ২০১৩ সালের সমীক্ষা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ৩৪% শিশু দারিদ্রসীমা ও সামাজিক বঞ্চনার সম্মুখীন হয়েছে। সামাজিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক অসমতা এমন হারে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, সমগ্র দারিদ্র জনগোষ্ঠীর ১০%, তাদের উপার্জিত আয়ের ৫৬.৫% হারাতে পারে বলে আশঙ্কা করা যায়।

একই সময় যখন গ্রিসের জনগণ পুনঃপুন মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সামাজিক অবক্ষয়ের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছে তখনই আইন প্রণয়নকারী পরিষদ দুর্নীতিকে আরও সক্রিয় করার লক্ষ্যে সমাজের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর জন্য "বিশেষ অধিকার আইন (Policy of Privileges)" নিয়ে এলো। এরকম একটা অধিনিয়ম বহুমুখী সুবিধা নিয়ে আসতে পারে এবং অপরাধীদের দায়মুক্তি ঘটাতে পারে। এমনকি কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর জন্য রক্ষাকবচ হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে-বিশেষত সিমেন্স/ রণসজ্জামূলক কর্মসূচি কিংবা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানাধীকরণের মত বিশেষ ক্ষেত্রে জনসমর্থনের জন্য। অথবা, এমন কোন প্রশসনিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত, যেখানে কোন মামলা দীর্ঘদিন যাবৎ বিচারবিভাগীয় স্থিরতা কিংবা সীমাবদ্ধতার জন্য ঝুলে আছে। পরিতাপের বিষয় হল, ঋণদাতা সংস্থাগুলোও গ্রিস প্রশাসনকে চাপ দিচ্ছে কর ফাঁকি দেওয়া জনগণের উপর কঠোর হতে। অন্যদিকে "আন্ত:সীমান্ত লেনদেন (Cross Border Transaction)-এর উপর ২৬% কর মওকুফ করতে।

রাষ্ট্রীয়-সাংগঠনিক অপরাধ, ব্যক্তিগত অপরাধ কিংবা গোষ্ঠীগত বিচ্যুতি থেকে বড়। কেননা তাকে আইনের আওতায় আনা কঠিন। এটি অনাচারের অন্তঃমূলে বাস করে; সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার ব্যপ্তি, ফলে গোষ্ঠীগত প্রতিনিধিত্ব কিংবা ব্যক্তি সচেতনতাবোধ এখানে গৌণ হয়ে পড়ে। দৈববিড়াম্বনা এই যে, এ ধরনের রাষ্ট্রীয়-সাংগঠনিক অশুভ আঁতাত বর্তমান "যুগের ভাবধারা (Spirit of time)" হয়ে দাড়িয়েছে।

আমরা এখন মারাত্নক হুমকির সম্মুখীন। আমরা কি করতে পারি যখন "রাষ্ট্রীয়-সাংগঠনিক অপরাধ" এমন একটা জায়গায় গিয়ে দাড়িয়েছে যে, বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ফ্যাসিবাদী আচরণের সাথে এর মিল পাওয়া যায়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কিংবা বৈজ্ঞানিক ও গবেষণাভিত্তিক তত্ত্বগুলো রাষ্ট্রযন্ত্র, অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও প্রশাসনিক নীতিমালার নিকট অকার্যকর ও অবাস্তব বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে!

একটি নতুন ও সুন্দর পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন আমাদেরকেই দেখতে হবে। অন্যথায় এই রাষ্ট্রযন্ত্র ও পুঁজিবাদী সমাজের আধিপত্য আরও বহুদিন থাকবে। কিন্তু আমরা তাকে গ্রহণ করতে পারব না। এটি একটি চলমান বহুমুখী প্রক্রিয়া। একজন সচেতন নাগরিক ও গবেষক হিসেবে আমাদের উচিৎ একে প্রতিরোধ করা ও সমাজের সামনে-এর ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরা। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
Stratos Georgoulas <s.georgoulas@soc.aegean.gr>

> আর্জেন্টিনাতে গর্ভপাত আন্দোলন
মিসোপ্রজলের যুগে

জুলিয়া ম্যাকরেনোল্ডস-পেরেজ, উইস্কনসিন বিশ্ববিদ্যালয়-লা ক্রোস, ইউএসএ

এক কুমারীর মূর্তিতে নারীবাদীরা-" তোমার সিদ্ধান্ত, নিরাপদ গর্ভপাত" সচেতনতামূলক প্রচারণা চালায় এবং সরাসরি যোগাযোগের জন্য ফোন নম্বর দেয়।

লাতিন আমেরিকাতে গর্ভপাত বিতর্ক একটি ভূমিকম্পের মত নাড়া দিয়ে গেছে, এবং যার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে একটি ছোট সাদা বড়ি। মিসোপ্রজল (Misoprostol) হচ্ছে গোপনে গর্ভপাত করার প্রসঙ্গে নিজেকে সহায়তা করার নতুন পদ্ধতি। মিসোপ্রজল সহজলভ্য হওয়াতে এই অঞ্চলে গোপনে গর্ভপাত করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাব নিয়ে এই পরিবর্তনের সূচনা। গর্ভপাত বিষয়ে রাজনৈতিক বিতর্কে পরিবর্তন নিয়ে আসেন কয়েকজন নারী যারা একইসাথে নারীবাদী ও স্বাস্থ্য সেবায় পেশাগতভাবে নিয়োজিত। এই কাজে নিয়োজিত সক্রিয় কর্মীরা নিরাপদে গর্ভপাতের সুযোগকে আরও সহজলভ্য এবং প্রকাশ্য করতে চান, যদিও এর বৈধতা নিয়ে কঠোর বিরোধ রয়েছে।

লাতিন আমেরিকা জুড়ে বহুকাল যাবৎ গর্ভপাত অবৈধ, পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ক্যাথলিক অধ্যুষিত অঞ্চল হলেও সেখানে গর্ভপাত চর্চার বিষদ ব্যপ্তি ঘটেছে। লাতিন আমেরিকাতে ধনী নারীরা নির্বিঘ্নে নিরাপদে বেসরকারি ক্লিনিকের দক্ষ চিকিৎসকের মাধ্যমে অনেক খরচ করে এবং গোপন পদ্ধতিতে গর্ভপাত করানোর সুযোগ গ্রহণ করে থাকেন। অন্যদিকে দরিদ্র নারীরা পুরনো ও অনুন্নত পদ্ধতি ব্যবহার করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গর্ভপাত করে থাকেন।

গোপন গর্ভপাতের এই দ্বৈত ব্যবস্থা এবং এর বৈধতার বিষয়ে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক বিতর্কের, বেশির ভাগই জনসাধারণের দৃষ্টির আড়ালে ছিল। তবে ১৯৯০-এর দশকের প্রথম ভাগ থেকে গর্ভপাত ও এই সংক্রান্ত রাজনৈতিক চর্চার ভৌগোলিক স্থানান্তর ঘটেছে। মিসোপ্রজল, আমেরিকান ফুড এন্ড ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) দ্বারা অনুমোদিত একটি কৃত্রিম প্রোস্টাগ্লাডিন (synthetic prostagladin) যা আলসার নিরাময়ের জন্য তৈরি হয়েছে। তখন থেকে লাতিন আমেরিকায় ঔষধের দোকানে এটি আলসারের উদ্দেশ্যে বিক্রয় হতে থাকে। মিসোপ্রজল জরায়ু সঙ্কোচনের কারণ হতে পারে ফলে এটি গোপন গর্ভপাতের জন্য একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। যেসব দেশে গর্ভপাত বৈধ সেখানে মিসোপ্রজল অন্য একটি ঔষধ, মিফেপ্রিস্তনের (mifepristone) সাথে মিশ্রণ করে চিকিৎসার মাধ্যমে গর্ভপাতের জন্য প্রথম ত্রৈমাসিক গর্ভাবস্থায় প্রয়োগ করা হয়। মিসোপ্রজল ব্যবহারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল চিকিৎসক ছাড়াই নিজে ব্যবহার করে গর্ভপাত করতে চান, তারপরেও পূর্বের অনুন্নত পদ্ধতির চেয়ে সেটি নিরাপদ হবে। পূর্বের অনুন্নত পদ্ধতিতে প্রায়শই কোট ঝোলানোর তার অথবা সোয়েটার বোনার কাঁটা ব্যবহার হত।

২০১২ থেকে ২০১৫-এর মধ্যে আমি আর্জেন্টিনাতে নৃতাত্ত্বিক গবেষণা করি যার উদ্দেশ্য ছিল ঔষধ তৈরির নতুন প্রযুক্তি কিভাবে গর্ভপাত করা এবং এই বিষয়ে রাজনৈতিক বিতর্কের মোড় কতটা ঘুরিয়ে দিতে পারে তা বিশ্লেষণ করা। আর্জেন্টিনা এবং পুরো লাতিন আমেরিকাতে মিসোপ্রজল তুলনামূলকভাবে

>>

মিসোপ্রজল-সেচ্ছায় গর্ভপাতের জন্য বহুল ব্যবহৃত এক ধরনে ঔষধ।

সহজলভ্য হওয়াতে গর্ভপাত আন্দোলনে নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবনের সুযোগ পাওয়া যায়। গর্ভপাত আন্দোলনের বহু কর্মী-দল আন্ত:দেশীয় প্রচারাভিযানে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়। ২০০১ সালে ডা: রেবেকা গমপার্টস "উইমেন অন ওয়েভস (Women on Waves)" চালু করে। গর্ভপাত নিষিদ্ধ উপকূলীয় দেশগুলোর তীরবর্তী অঞ্চলে, আন্তর্জাতিক পয়েন্টে অবস্থানরত চিকিৎসা সরঞ্জাম সজ্জিত নৌযান থেকে আবার নারীদের নিরাপদে গর্ভপাতের জন্য আমন্ত্রণ জানান। এই প্রচারাভিযানের পর, তিনি "উইমেন অন ওয়েভস (Women on Waves)"-এর অনলাইন কার্যক্রম শুরু করেন, যেখানে পৃথিবীর যেকোন স্থান থেকে যে কেউ গর্ভপাত বিষয়ে যেকোন ধরনের স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারে। গর্ভপাত যেসব দেশে অবৈধ, সেখানে বসবাসরত নারীদের চাহিদাপত্রগুলো এই সংগঠন তাদের ইমেইলে সরাসরি পৌঁছে দেয়। তবে এসব ক্ষেত্রে প্যাকেজে কোন চিহ্ন রাখা হয় না। তাছাড়াও গমপার্টসের সংগঠন পৃথিবী জুড়ে নারীদের হট-লাইনে গর্ভপাত বিষয়ক সেবা দিয়ে থাকে। ফলে যেকোন নারী সমস্যায় পড়লে বিস্তারিত নির্দেশনার জন্য যোগাযোগ করতে পারে, ও জানতে পারে যে, গর্ভপাতের জন্য কিভাবে মিসোপ্রজল ব্যবহার করতে হয়।

যখন ডা: গমপার্টসের আন্ত:দেশীয় প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিক গণমাধ্য-মের নজর কাড়ে, তখন স্থানীয় কর্মকৌশলগুলো কিছুটা কম গুরুত্ব পায়। এই কর্মকৌশলগুলো প্রতিনিয়ত নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে। লাতিন আমেরিকা জুড়ে, তরুণ নারীবাদীরা নেতৃত্ব নেন ফলে দরিদ্র নারীদের কাছে নিরাপদ গর্ভপাত আরও সহজলভ্য হয়। কিছু দল তথ্য সরবরাহ করে, কোন কোন দল গর্ভপাত সংক্রান্ত ঔষধ পত্রের সেবা দিয়ে থাকে। আর স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের অনেকে জনসাধারণের জন্য স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থার ভেতর থেকে কর্মীদের ভূমিকায় কাজ করেন।

Lesbianas y Feministas por la Descriminalizacion del Aborto (Lesbians and Feminists for the Decriminalization of Abortion, or LFDA) বিগত সাত বছরে উদ্ভব হয়ে আর্জেন্টিনাতে সমকামী নারী এবং নারীবাদী-দের অন্যতম সক্রিয় কর্মী দলে পরিণত হয়। LFDA প্রথমে "উইমেন অন ওয়েভস (Women on Waves)"-এর সাহায্য নিয়ে নিরাপদ গর্ভপাতের সেবা দিতে একটি হটলাইন স্থাপন করে। পরবর্তীতে আর্জেন্টিনার বিভিন্ন এলাকায় নারীদের নিরাপদ গর্ভপাতের প্রসঙ্গে তথ্য প্রদান করে। উপরন্তু ২০১৩ সালে LFDA বুয়েন্স অ্যায়ার্স শহর জুড়ে বেশ কয়েকটি গর্ভপাত বিষয়ক পরামর্শদানকারী চিকিৎসাকেন্দ্র চালু করে। এসব চিকি-ৎসাকেন্দ্রে সক্রিয় কর্মীরা সরাসরি বসে উপদেশ দেয়। খুব সহজ ভাষায় নিরাপদে কিভাবে গর্ভপাত করা যায় তা কারিগরি ভাষায় না বলে সহজ ভাষায় বোঝায়। সেবা প্রার্থীরা স্থানীয় ঔষধের দোকান বা চোরা বাজার থেকে মিসোপ্রজল ক্রয় করে বলে মনে করা হয়।

LFDA, অন্যান্য সক্রিয় কর্মীদলের মত একই সেবা প্রদান করে, তবে তাদের কাজগুলো দুটি নীতি দ্বারা সুরক্ষিত বলে ব্যাখ্যা করা যায়, একটি হলো " অবাধ তথ্য" আর অন্যটি হলো জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে "স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস" করা। প্রথম দাবিটি এইজন্য যে LFDA কোন চিকিৎসা সেবা কিংবা ঔষধ ছাড়াও শুধু তথ্য সেবার মাধ্যমে একজন তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে সম-স্যার সমাধান করতে পারে। পরের দাবিটি "স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস", শব্দটি চয়ন করা হয়েছে জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি থেকে এবং সমাজের বৃহৎ দায়বদ্ধতা থেকে জনস্বাস্থ্যের হুমকি হতে পারে সে ধরনের পদ্ধতি যেন নিষিদ্ধ করা হয়, সেই বিষয়ে কর্মসূচি গ্রহণ করে।

অন্য একটি সক্রিয় কর্মী দল LFDA-এর চেয়েও বেশী কর্মসূচি পালন করে থাকে। ২০১৪ সাল থেকে, স্থানীয় একটি সক্রিয় কর্মী দল "Socorristas en Red (first responders online)" নামে একটি জাতীয় আন্দোলন শুরু করে। এই অনলাইন নেটও-য়ার্ক শুধু তথ্য নয় সেই সাথে গর্ভপাতের ঔষধ মিসোপ্রজলও তাদের ভাষায় acompanamiento (accompaniment) সরবরাহ করে। এই সক্রিয় কর্মী দল গর্ভপাতের জন্য ঔষধের সম্পূর্ণ কোর্সটি প্রদান করে (আন্তঃদেশীয় সক্রিয় কর্মীদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে এইগুলো সংগ্রহ করা যায়)। একই সাথে মোবাইল ফোনে পরামর্শ নিয়ে বাড়িতেই গর্ভপাত করা যায়। কারণ এই সক্রিয় কর্মী দলগুলো শুধু তথ্য নয় গর্ভপাতের ঔষধও সরবরাহ করে, যদিও তারা অনেকাংশেই প্রচারবিমুখ। বুয়েন্স অ্যায়ার্সের মত প্রধান শহরে এই দলগুলো তুলনামূলকভাবে জনসমক্ষে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারে। কিন্তু রক্ষণশীল অঞ্চলগুলোতে কর্মী দলগুলো আরও বেশি সেবা গ্রহণকারীদের নিজ বিচার বিবেচনা ও স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে, যেন যেকোন আইনগত ঝামেলা এড়িয়ে চলা যায়।

অবশেষে, কিছু পেশাজীবী স্বাস্থ্যকর্মী আর্জেন্টিনার জনস্বাস্থ্য ব্য-বস্থাতে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিন পরিবর্তন আনতে শুরু করে। অনেক সময় এই সেবাটিকে "প্রাক গর্ভপাত এবং গর্ভপাত পর-বর্তী পরামর্শ" বলা হয়ে থাকে। LFDA সক্রিয় কর্মী দলের মত তারাও মিসোপ্রজল ব্যবহার করে গর্ভপাত করার জন্য বিস্তারিত তথ্য দিয়ে থাকে, যাতে করে নারীর কাছেই আইনানুগ বিষয়টি

>>

নির্ভর করে এবং বাসায় থেকেই মিসোপ্রজল ব্যবহার করে স্বাভাবিক গর্ভপাত করতে পারে। বেশকিছু চিকিৎসাকেন্দ্রে স্বাস্থ্যকর্মী ও ডাক্তারগণ পৌরসভাভিত্তিক স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অথবা তাদের অনুকূল তত্ত্বাবধায়কদের পৃষ্ঠপোষকতায় কাজ করে। অল্প সংখ্যক চিকিৎসাকেন্দ্র প্রকৃতপক্ষে গর্ভপাত প্রক্রিয়াকে এমনভাবে সম্পন্ন করে যেন "আইনগতভাবে বৈধ গর্ভপাত" করতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে যুক্তিটি এভাবে দেখানো হয় যে, অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ একটি স্বাস্থ্য ঝুঁকি। যাতে করে সকল গর্ভপাত পেনাল কোডে আইনগতভাবে বৈধতা দেওয়া হয় যা নারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা করবে। ফলে স্বাস্থ্যকর্মী ও ডাক্তারগণ সরাসরি তাদের রোগীদের গর্ভপাতের সেবা দিয়ে থাকে। এসব ঘটনার বাইরে অনেক স্বাস্থ্য কর্মী সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছেন যে, তারা প্রকাশ্যেই মিসোপ্রজল ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। অনেক সময় গোপনীয়তা রক্ষার্থে ব্যবস্থাপত্র দেন, যাতে বাইরে থেকে ঔষধ কিনে নিতে পারে।

কতজন ডাক্তার এই ধরনের কার্যক্রমের সাথে জড়িত তার কোন সঠিক হিসেব নেই। যদিও তারা পদের ক্রমানুসারে অবশ্যই সংখ্যালঘু হবে কারণ বেশির ভাগ পদ দখল করে আছে সামাজিকভাবে রক্ষণশীল ও প্রাক্তন ক্যাথলিক ছেলেদের নেটওয়ার্ক। তবুও এই কার্যক্রমের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব অবশ্যম্ভাবী-বিশেষ করে যখন সক্রিয় কর্মীরা তাদের সেবাগ্রহীতার কাছ থেকে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক এবং স্বাস্থ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে। সেগুলো এমনভাবে প্রকাশ করা হয় যেন অবৈধ গর্ভপাত একটি জনস্বাস্থ্য বিষয় হিসেবে সকলের কাছে প্রতীয়মান হয়। প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলো অনলাইনে পাওয়া যায়। চিকিৎসক ও পেশাজীবীগণ জাতীয় পর্যায়ে সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, এবং জাতিসংঘের *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women CEDAW,* ছায়া প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করা হয়। সিইডিএও-এর মাধ্যমে গর্ভপাতের চর্চা বর্তমানে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি দেখা যায়, যাকে আমি বলি "feminist epidemiology"।

বিশেষকরে, আর্জেন্টিনাতে গর্ভপাত সংক্রান্ত চিকিৎসার সহজলভ্যতা গর্ভপাত আইন বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের ব্যর্থতাকেই অনেকাংশে নির্দেশ করে। কারণ দেশটি তাঁর গর্ভপাত আইনগুলোর যথাযথ সুরক্ষা দিতে পারেনি, সেগুলো বইয়ের মধ্যেই রয়ে গিয়েছে বাস্তবায়নে কোন পরিবর্তন আসেনি। ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া এই ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার বিষয়ে অবশ্যই রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি ছিল। আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর প্রচেস্টা হয়ত অসহায় তরুণ নারীদের জন্য বিশেষ সহানুভূতি তৈরি করে, যাদের পুলিশ বাহিনীর প্রতিহিংসার শিকার হতে দেখা যেতে পারে। আন্দোলন কর্মীদের সমন্বিত উপাত্তানুসারে হাজার হাজার নারীদের জীবনের ঝুঁকি ছাড়াই গর্ভপাতে সহায়তা করেছে। এরই মধ্যে আর্জেন্টিনার সর্ববৃহৎ নারীবাদী আন্দোলন দাবি করতে থাকে যে, চাহিদা অনুযায়ী গর্ভপাতের বৈধতা দিতে হবে।

আর্জেন্টিনার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন, যেভাবেই হোক নারীবাদীদের জন্য নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। ২০১৫-এর শেষের দিকে একটি ডানপন্থী রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসে। প্রেসিডেন্ট Christina Fernandez de Kirchner-এর পরিবর্তনের সাথে সাথে তার কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব ছেড়ে যায়। অন্যদিকে এটি আনন্দের বিষয় ছিল, কারণ নিরাপদ পদ্ধতির প্রসার করেছিল।

সম্প্রতি, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দল আর্জেন্টিনার একটি শাস্তির সিদ্ধান্তের নিন্দা করেন, যেখানে একজন তরুণীর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ উঠেছিল। টুকিউম্যান, দেশটির উত্তরাঞ্চলে একটি রক্ষণশীল অঞ্চল, সেখানে তরুণীটি গর্ভপাত করার পর স্থানীয় একটি হাসপাতালে সাহায্যের জন্য যায়। মিসোপ্রজল এত ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছিল এবং ব্যবহারের প্রমাণ বা কোন চিহ্ন থাকে না বলে রক্ষণশীল ডাক্তারগণ সন্দেহ করেন। কারো গর্ভপাত হলে মনে করা হয়, তারা নিজেই ঔষধ ব্যবহার করে গর্ভপাত করেছে। এই ঘটনায় বেলেন (মিডিয়া প্রতিবেদনে ব্যবহৃত ছদ্মনাম)-কে আট বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। যে রায় মেনে নেয়া যায় না। কারণ অভিযোগটির কোন প্রমাণ নেই। ২০১৬ সালের প্রথম দিকে যখন সে শুনানির জন্য অপেক্ষা করছিল, ইতোমধ্যেই সে দুই বছর জেলে কাটিয়েছে। দীর্ঘ দিন পর যখন এই রায় ঘোষণা হয়, তখন বেলেনের মুক্তির জন্য আর্জেন্টিনা জুড়ে গর্ভপাত ও নারীবাদী কর্মীরা একত্রিত হয়ে মিছিল করে আন্দোলন শুরু করে। পর্বতসম চাপের মুখে বেলেনকে ২০১৬ সালের আগস্ট মাসে, টুকিউম্যানের প্রাদেশিক সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশের ভিত্তিতে তার মুক্তি দেয়া হয়।

প্রশ্ন থাকে যে, গর্ভপাত সমর্থনকারীদের দমন করে, আরো অনেক বেলেন-এর উপর আগ্রাসী হয়ে, আর্জেন্টিনার বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তি কি গর্ভপাত আন্দোলন বন্ধ করার জন্য নেতৃত্ব দিবে? যখন নতুন ডানপন্থী নেতৃত্ব চিন্তার কারণ হয়েছে, তখন এটি নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, আন্দোলনকারীরা আর কোনভাবেই পিছু হটবে না বা ঘুড়ে দাঁড়াবে না: বিগত দুই দশকে তাদের পরিশ্রম চিরতরে লাতিন আমেরিকার গর্ভপাতকে ঘিরে রাজনৈতিক গতিকে পাল্টে দিয়েছে, এবং আন্দোলনকারীরা আশা করে যে, তাদেরকে প্রতিরোধ কোনভাবেই সম্ভব নয়। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
Julia McReynolds-Pérez <julia.mcreynolds@gmail.com>

> মেক্সিকোর গর্ভপাত আইনের বিলোপ

সুজানা লার্নার, এল কোলেগিও দে মেহিকো, মেক্সিকো; **লুসিয়া ম্যালগার**, ইনস্তিতিউতো তেকনোলোজিকো অতোনোমো দে মেহিকো, মেক্সিকো; **এগনেস গুইলাইমি,** ইনস্তিউতো দ্য খেশেখশে পুহ ল্য দেভেলোপমঁ, ফ্রান্স।

গর্ভপাত বৈধকরণে ম্যাক্সিকান আন্দোলন।

২০০৭ সালে মেক্সিকোর ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট (দিস্ত্রিতো ফেদেরাল, সম্প্রতি যার নতুন নামকরণ করা হয়েছে: মেক্সিকো সিটি) গর্ভাবস্থার প্রথম বারো সপ্তাহের মধ্যে গর্ভপাতকে বৈধ ঘোষণা করেছিল। ১৯৯০-এর দশক থেকে যারা নারীর মতামতকে অগ্রাধিকার দেবার জন্য আন্দোলন করে আসছিল, সেই সুশীল সমাজ একে এক বিজয় হিসেবে অভিহিত করেছিল। যদিও মেক্সিকোর অধিকাংশ শহরেই গর্ভপাত তখনও নিষিদ্ধ ছিল।

২০০৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত মেক্সিকোর ১৮টি প্রদেশে "গর্ভধারণের মূহুর্ত থেকেই জীবনকে সুরক্ষিত" করার জন্য নতুন আইনগত ও সাংবিধানিক সংস্কার অনুমোদন করা হয়েছে। সম্প্রতি ২০১৬ সালের জুলাইয়ে, এই তালিকার সর্বশেষ সংযোজন হিসেবে ভেরাক্রুজ প্রদেশেও একই আইন পাশ হয়েছে। এসকল তথাকথিত সংস্কারের পেছনের কারণগুলো কী কী এবং এসকল সংস্কার কী ধরনের তাৎপর্য বহন করে?

মেক্সিকোর গর্ভপাত সংক্রান্ত আলোচনার সাথে জড়িত বিতর্ক ও প্রধান কুশীলবদের বুঝতে গেলে সীমান্তসংক্রান্ত জনসংখ্যাগত রাজনীতি বুঝতে হবে। ১৯৭০ সাল থেকে মেক্সিকান সরকার পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির পাশাপাশি অন্যান্য উদ্যোগের মাধ্যমে গর্ভধারণের হার হ্রাস ও পরিবারের আকার নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে মহিলাদেরকে নানাবিধ পদক্ষেপের আওতায় আনা হয়। যা পারিবারিক সুস্বাস্থ্য, জীবন ও ভালো থাকাকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়। যদিও, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এসব কর্মসূচির সাফল্য অনস্বীকার্য, কিন্তু এই কর্মসূচির পক্ষে কোন বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমর্থন না থাকার দরুন জনসংখ্যার বাস্তবিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না।

১৯৯০ সালের জাতীয় নীতিমালাতে মেক্সিকান সরকার "প্রজনন স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব" দেয় এবং পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এ বিষয়টিকেই মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। কায়রোতে সাক্ষরিত এই চুক্তিতে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। এই চুক্তিতে বলা হয়েছিল, অনুপযুক্ত অবস্থায় গর্ভপাত করা হলে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়। চুক্তিটিতে আইনগত প্রতিবন্ধকতা দূর করা এবং গর্ভপাত-বিরোধী আইন শিথিল করার মাধ্যমে মহিলাদের নিরাপদ গর্ভপাত ঘটানোর সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলোকে আহ্বান জানানো হয়।

বিগত বিশ বছর যাবত নারীবাদী ও শিক্ষা বিদরা গর্ভপাতকে বৈধতা দেওয়ার জন্য মেক্সিকোর ফেডারেল ডিস্ট্রিক্টকে তাগাদা দিয়ে আসছিল, যার মাধ্যমে আন্দোলনটি মেক্সিকো সিটিতে মধ্যপন্থী ও ধারাবাহিক সংস্কারের চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছেছিল। ২০০৭ সালে দিস্ত্রিতো ফেডারেলের (Distrito Federal) আঞ্চলিক আইনসভা গর্ভাবস্থার বারো সপ্তাহের মধ্যে সংঘটিত গর্ভপাতকে বৈধতা দেওয়ার জন্য ভোট দিয়েছিল (যদিও কিছু বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় গর্ভাবস্থার পরবর্তী ট্রাইমিস্টারগুলোতে গর্ভপাত ঘটানো হলে তা অবৈধ হিসেবে গণ্য হয়)। গুরুত্ব সহকারে বলা যায়, গর্ভাবস্থা হলো "মানুষের প্রজনন প্রক্রিয়ার একটি অংশ যার সূচনা হয় এন্ডোমেট্রিয়ামে ভ্রূণ সঞ্চারণের মধ্য দিয়ে", গর্ভাবস্থার এমন সংজ্ঞায়ন করে, দিস্ত্রিতো ফেডারেলের সংস্কার কার্যক্রমটি কখন এবং কীভাবে জীবনের সূত্রপাত হয়, সেই আলোচনাকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল। ২০০৭ সালের আইন অনুযায়ী ডাক্তাররা "বিবেকবান আপত্তিকারী"র ভূমিকায় আবির্ভূত হয়ে গর্ভপাত করাতে অস্বীকৃতি জানানোর অধিকার রাখেন, কিন্তু আইন অনুযায়ী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবশ্যই এমন ডাক্তারদের নিযুক্ত করতে হবে যারা কর্মচারীদের প্রতি আপত্তি প্রদর্শন করতে পারবেন না। শাসক দল পিআরআই (PRI) সহ উদারপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো এই আইনের পক্ষে এবং ডানপন্থী রাজনৈতিক দল পিএএন (PAN)-এর বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল।

জনস্বাস্থ্য সেবার আওতায় বিনামূল্যে ও ঝুঁকিমুক্ত গর্ভপাত করার সুযোগ প্রদানের ক্ষমতাটি মেক্সিকো সিটির একচ্ছত্র এখতিয়ারে ছিল। জনস্বাস্থ্য সেবাকে বাধ্য করার মধ্য দিয়ে এই আইনে সব নারীদেরকে গর্ভাবস্থার বৈধ সমাপ্তি ঘটানোর অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছিল। বিশেষ করে, এই আইনে অন্তঃসত্ত্বা নারীদের করণীয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, যেমন নারীরা গর্ভাবস্থা বহাল রাখতে

>>

পারতেন, সন্তানকে দত্তক দিতে পারতেন, অথবা একবার সম্মতিপত্রে স্বাক্ষর করে গর্ভপাত করতে পারতেন। এছাড়াও আনুষাঙ্গিক অপরিকল্পিত গর্ভধারণ (আর এভাবে, পরবর্তী গর্ভপাতগুলো পরিহার করার জন্য) রোধ করার জন্য গর্ভনিরোধক পদ্ধতির ব্যবস্থা করার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল।

এভাবে মেক্সিকো সিটির সংস্কার কার্যক্রমগুলো অনিরাপদ গর্ভপাতকে জনস্বাস্থ্য, সামাজিক ন্যায়বিচার ও বৈষম্য সংশ্লিষ্ট একটি প্রসঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সর্বোপরি, এই আইনের অধীনে একজন নারীর শরীর এবং প্রজননগত স্বাধীনতার প্রেক্ষিতে তার নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারকে নিশ্চিত করার মাধ্যমে মানবাধিকারের সুরক্ষা দেওয়া হয়েছিল। গত ৯ বছরের সংস্কারের ফলে ১৬০,০০০ জনের বেশি নারী নিরাপদ গর্ভপাত করার সুযোগ পেয়েছেন। মেক্সিকোর অন্যান্য প্রদেশ থেকেও নারীরা এই সুবিধা পাওয়ার জন্য মেক্সিকো সিটিতে চলে আসেন।

ক্যাথলিক যাজকতন্ত্রের নেতৃত্বাধীন এবং ইভাঞ্জেলিকাল ও অন্যান্য খ্রিস্টান ডিনমিনেশনের সমর্থনপুষ্ট ডানপন্থী জোট প্রতিক্রিয়া জানাতে বিলম্ব করেনি। বিশ্বের অনেক জায়গাতেই রক্ষণশীলরা "জীবন প্রতিরক্ষা" করার জন্য ভ্রূণের কল্পিত অধিকারের কাছে নারীর স্বাধীনতা ও জীবন বিসর্জন দেওয়ার পক্ষে জোর দেন। তারা অনিরাপদ গর্ভপাতের ঝুঁকি কিংবা নারীর স্বাস্থ্য ও তার পরিবারের উপর কী ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে তা অস্বীকার করে ভ্রুণকে "একজন ব্যক্তি" হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। অন্যদিকে নারীবাদী দলগুলো নারী অধিকারের প্রাধান্য ও সর্বজনীন স্বাস্থ্য অধিকার রক্ষা করার জন্য আন্দোলন করে। তাদের মতে, নারীর মাতৃত্ব হতে হবে মুক্ত ও স্বাধীন। তারা গীর্জা ও রাষ্ট্রকে পৃথক রাখার নীতিকে মেক্সিকোর গণতন্ত্রের মধ্যমণি হিসেবে স্থাপন করার পক্ষে জোরারোপ করে থাকেন।

মেক্সিকো সিটি যখন প্রথম-ট্রাইমিস্টার (first-trimester) গর্ভপাতের জন্য অধিকতর সুযোগ প্রদান করতে শুরু করেছিল, তখন প্রোভিদা (প্রো-ফ্যামিলি), প্রোফ্যামিলিয়া (প্রো-ফ্যামিলি) এবং মেক্সিকোর ক্যাথলিক বার এসোসিয়েশনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো জোর গলায় বলেছিল, "গর্ভধারণের মুহূর্ত থেকেই জীবনের সূত্রপাত হয় এবং সেই মুহূর্ত থেকে একজন মানুষ হিসেবে তার অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে"। গর্ভপাত-বিরোধী সক্রিয় কর্মীরা অনেক ধরনের কৌশল অবলম্বন করেছিল, যার মধ্যে ছিল-নিয়মিত রাস্তায় বিক্ষোভ সমাবেশ, বিভিন্ন শহরে বিশপদের সংগ্রামের আহ্বান, নারীদের গর্ভপাত করতে বাধা দেওয়ার জন্য সরাসরি প্রতিরোধ, তদবির ও মামলা-মোকদ্দমা। একইভাবে তারা ইতোপূর্বে আইনিভাবে বৈধতাপ্রাপ্ত সমলিঙ্গ বিবাহের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিল, এবং পাবলিক স্কুলে পরিবার পরিকল্পনা ও যৌনশিক্ষার পাঠ্যক্রমের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। তারা অতি চতুরতার সাথে "যৌন ও প্রজনন অধিকার" নামক পরিভাষাটিকে এবং লৈঙ্গিক প্রেক্ষাপট সংক্রান্ত প্রসঙ্গটিকে অনেক সর্বজনীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দলিল থেকে সফলতার সাথে মুছে ফেলেছে।

২০০৮ সালে রক্ষণশীল দলগুলো সরকারের এসব সংস্কারমূলক কাজকে প্রতিরোধ করার জন্য সর্বোচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিল। গর্ভপাত বৈধকরণ প্রক্রিয়াটি আদালতে সংবিধানসম্মত প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তিনটি আনুষাঙ্গিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত রায় প্রদান করা হয়েছিল। প্রথমত, আদালত কর্তৃক একজন নারীর শরীরের উপর তার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল-এই অধিকার দ্বারা বুঝানো হয় যে, রাষ্ট্রকে অবশ্যই একজন নারীর মানবাধিকারের সুরক্ষা দিতে হবে যাতে তারা তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এবং জীবন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। দ্বিতীয়ত, আদালত রায়ে উল্লেখ করেছে, জীবন সুরক্ষার অধিকার কোন অকাট্য অধিকার নয়, এমনকি এটি সংবিধান ও আন্তর্জাতিক চুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অন্য কোন অধিকারের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোন অধিকারও (super-right) নয়। কাজেই অধিকারগুলোর একটির সাথে যখন অন্যটির সংঘর্ষ দেখা যায়, তখন আইনসভাকে বাধ্য হয়েই বিকল্পগুলোকে অধিকারগুলো নির্বাচন করতে হয়। সবশেষে, আদালত দ্বিতীয় তথ্যটির উপর ভিত্তি করে আঞ্চলিক আইনসভাকে আঞ্চলিক দণ্ডবিধিতে পরিবর্তন আনার ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন।

সুপ্রীম কোর্টের রায়ের প্রাক্কালে রক্ষণশীল দলগুলো প্রাদেশিক সংবিধান বা দণ্ডবিধিগুলোতে সামান্য পরিবর্তন আনার দাবি জানানোর জন্য প্রাদেশিক আইনসভাগুলোর দ্বারস্থ হয়েছিল। তারা "গর্ভধারণ" বা "গর্ভধারণের মুহূর্ত থেকেই জীবনকে রক্ষা" করার দাবি জানিয়েছিল এবং গর্ভপাতের শরণাপন্ন হওয়া নারীদের দণ্ডিত করতে চেয়েছিল।

২০১৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে কতিপয় বামপন্থীসহ ক্যাথলিক গীর্জা ও সকল রাজনৈতিক দলের আইনপ্রণেতাদের সমর্থন পেয়ে গর্ভপাত-বিরোধী জোটগুলো মেক্সিকোর ১৮টি প্রদেশে তাদের এই লক্ষ্যবস্তু অর্জন করেছিল। এসকল নতুন আইনের বদৌলতে কখনো কাছের মানুষের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে "শিশু হত্যা" দায়ে, বিশ অথবা ত্রিশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে মেক্সিকান নারীরা এখন কারাগারে সাজাভোগ করছেন। অন্যদেরকে মনোরোগ সংক্রান্ত চিকিৎসার অধীনে আনা হয়েছে, যেন নিজের অধিকার চর্চা করা এক ধরনের মানসিক ব্যাধি। মেক্সিকোতে প্রচলিত আইনকানুনের ক্রমাগত ব্যর্থতার কারণে নতুন শাস্তিগুলো প্রাধান্য পাচ্ছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই নিয়মগুলোর ব্যত্যয় ঘটতে পারে এবং বৈধ ও নিরাপদ গর্ভপাত করার অনুমোদন দেয়। যেমন ধর্ষণ (একমাত্র ধর্ষণের লক্ষণ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে সারাদেশে গর্ভপাত আইনগতভাবে কার্যকর আছে), ভ্রূণীয় অস্বাভাবিকতা, অথবা নারীর স্বাস্থ্য বা জীবনের সংকটাপন্ন অবস্থায় গর্ভপাতের অনুমোদন রয়েছে।

২০১৬ সালের মাঝামাঝিতে এসেও দুটো বিপরীত অবস্থানকে জড়িয়ে গর্ভপাত সংক্রান্ত বিতর্কটি আবর্তিত হচ্ছে। একদিকে রক্ষণশীল দলগুলো ভ্রূণের তথাকথিত অধিকারের কাছে নারীদের জীবন ও স্বাধীনতাকে অধীনস্ত করার মাধ্যমে "জীবন রক্ষা" করার দাবি জানায়, যেটাকে একটি আইনি চেতনার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গণ্য করা হয়। এসব দল অনিরাপদ গর্ভপাতের পরিণতি যেমন, মায়ের মৃত্যু ও অসুখ অথবা পরিবারের উপর এর প্রভাব অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে উদারপন্থী দলগুলো নারীর অধিকারের গুরুত্ব, স্বাচ্ছন্দ্যে মাতৃত্ব লাভ ও সার্বজনীন স্বাস্থ্য অধিকারের পক্ষে প্রচারণা চালায়। একই সাথে তারা মেক্সিকোর সংবিধানের একটি মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মর্যাদা নিশ্চিত করার জোর দাবি জানায়।

মেক্সিকোর নারী অধিকারের দীর্ঘ সংগ্রাম এখনো চলছে। প্রায় সময়ই যখন রক্ষণশীল জোটগুলো গর্ভপাতকে অপরাধ হিসেবে প্রমাণ করার জন্য উঠেপড়ে লাগে, তখন নারীবাদী ও নারীদের নিয়ে কাজ করা এনজিওগুলো পূর্বসতর্ক হয়ে সক্রিয় হওয়ার বদলে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠে। এই আবর্তের অবশ্যই পরিবর্তন হওয়া উচিত। আমাদের মতে, সুশীল সমাজকে আরো জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে, এবং জাতীয় পর্যায়ে গর্ভপাত করার প্রক্রিয়াটির উদারীকরণ ও বৈধকরণের দাবিও জানাতে হবে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
Susana Lerner <slerner@colmex.mx>
Lucía Melgar <lucia.melgar@gmail.com>
Agnès Guillaume <Agnes.Guillaume@ird.fr>

> গর্ভপাত নিয়ে সহিংসতা:

একটি পেরুভিয়ান সংগ্রাম

এরিকা বুছে, প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়, পেরু এবং অভিবাসন (আরসি৩১), নারী ও সমাজ (আরসি৩২), সামাজিক আন্দোলন, সামষ্টিক ক্রিয়া, ও সামাজিক পরিবর্তন (আরসি৪৮), ও পরিবার গবেষণা (আরসি০৬) বিষয়ক গবেষণা কমিটির সদস্য।

২০১৩ সালের ২৩শে মার্চ পেরুর লিমায় "জীবনের জন্য অসহযোগ আন্দোলন" নামে গর্ভপাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়। ছবি: পাওলো এগুইলার/ইপিএ

২০১৬ সালের আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে সহস্রাধিক পেরুভিয়ান নাগরিক লিমার রাজপথে " একজনও কম নয় (Ni Una Menos)" স্লোগানে মুখরিত করে তোলে। আন্দোলনকারীদের মধ্যে ছিলেন সাম্প্রতিক সময়ে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট, শারীরিক ও যৌন সহিংসতার শিকার, নারী এবং নারীবাদী সংগঠনের সদস্যবৃন্দ, রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ এবং মন্ত্রী ও মহাসমাবেশ সংক্রান্ত প্রতিনিধিবৃন্দ। এই জনসমাবেশে নারীর প্রতি সহিংসতাকে প্রতিরোধের আহ্বান করা হয়। বিগত ৪০ বছরের মধ্যে পেরুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমাবেশগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম বলে ব্যাখ্যা করা হয়। সেখানে নারী-পুরুষ, মেয়ে-ছেলে, মাতাপিতা ও সন্তান, দাদা-দাদী, নানা-নানী এবং নাতি -নাতনি পায়ের সাথে পা মিলিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেছে।

এই সমাবেশে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য অনুঘটক হিসেবে একটি ভিডিও চিত্র দেখানো হয়, যে হোটেলের অভ্যর্থনার

>>

সামনে দিয়ে একটি নারীকে চুল ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তার প্রাক্তন ছেলে বন্ধু। যেভাবেই হোক তার মামলাটি নিস্পত্তি হয়ে যায়, বিচারক এভাবে সমাপ্তি টানেন যে, নারীটির শরীরে হতাহতের চিহ্ন দিয়ে ধর্ষণ বা হত্যা চেস্টার আলামত পাওয়া যায় না।

"যদি আমাদের একজন আঘাত পায় আমরা সবাই আঘাত পাই" এই স্লোগানের সাথে "একজনও কম নয় (Ni Una Menos)" স্লোগান দিয়ে নারীর প্রতি বৈষম্যতা ও সহিংসতার বিরদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য পেরুভিয়ানদের আহুবান করে। সংগঠকগণ আশাতীত সাড়া পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন। এটি লাতিন আমেরিকার শহরগুলোতে সমসাময়িক জনসমাবেশগুলোর মধ্যে অন্যতম যেখানে সাধারণ জনগণ নারীর প্রতি অশালীন আচরণের সমাপ্তি এবং ভেঙ্গে পরা বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের দাবি জানায়। অধিকাংশ লাতিন আমেরিকানদের কাছে এই বিক্ষোভ প্রদর্শন একটি আশা জাগানিয়া মুহূর্ত; যখন প্রচলিত ধারণাগুলো পরিবর্তিত হচ্ছে এবং নারী বিষয়ক প্রসঙ্গগুলো বিশেষত নারীর প্রতি সহিংসতা, জনসচেতনতার একেবারে সম্মুখভাগে রয়েছে।

প্রজননস্বাস্থ্য অধিকারকে ঘিরে লাতিন আমেরিকার নারীবাদীদের যে ছকে বাধা দাবি তার ধরনে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়; যখন নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া শুরু হয়েছে এবং দেখা গেছে আগ্রাসীব্যক্তি যিনি সহিংসতার সংঘটক তাকে দন্ড থেকে খালাস করে দেয়া হচ্ছে এবং নির্যাতনকারী রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। প্রজননস্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে পূর্বের চিন্তাটি ছিল একেবারেই ব্যক্তির নিজস্ব পছন্দ নির্ভর। গর্ভপাত বিষয়ে বিতর্কটি ছিল নারীর (ও কন্যার) প্রতি যৌন সহিংসতার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল "জোরপূর্বক মাতৃত্বকে"। নারীবাদী বিক্ষোভ পরবর্তীতে এই চিন্তাকে নতুন করে সাজায়, যেখানে বিতর্কটি গুরুত্ব দেয় রাষ্ট্র কিভাবে যৌন সহিংসতাকে উপেক্ষা করে নারী নির্যাতনকারীকে সহায়তা করছে।

রাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থায় "নারীর প্রতি সহিংসতা" কে একটি নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার না করে বরং গোপনে গর্ভপাত করাকে নারীর স্বার্থপর আকাঙ্ক্ষা পূরণের ফলাফল হিসেবে ধরে নেয়া হয়। তাই এই প্রচারাভিযানের বিরোধিতা করার অর্থ হবে এটা মেনে নেয়া যে, নারীর প্রতি সহিংসতা হওয়াটা তেমন কোন বিষয় নয়। এই সম্ভাবনাময় শক্তিশালী কাঠামোর খারাপ দিক নারীর অবস্থান নির্ধারণ করে নির্যাতনের শিকার হিসেবে, সম্ভাবনাময় জোরপূর্বক চিরকালের গৎবাঁধা জেন্ডার ভূমিকায় এবং ক্রমাধিকার অনুসারে স্তরের নিম্নভাগে অবস্থান করে। অন্যদিকে, নারীর অধিকার বিষয়ক সুযোগ থেকে গর্ভপাতের কাঠামোগত পরিবর্তন এবং ধর্ষণের প্রসঙ্গে গর্ভপাতকে নিরাপরাধকরণের ব্যাপারে বেশ সমর্থন পাওয়া যায়।

শুধুমাত্র নিরাপরাধ গর্ভপাতের উপর জোর না দিয়ে আন্দোলনকারীরা সুশীল সমাজ, পেশাজীবী যেমন ডাক্তার, এবং ধর্মীয় সংগঠনের সদস্যদের কাছে অনুরোধ করেন যে, নারীর অধিকার এবং নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে পেরুভিয়ানদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের প্রয়োজন। এই বৃহৎ কাঠামোগত পরিবর্তন- প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার থেকে যৌন সহিংসতা, অন্যান্য দল যেমন -এলজিবিটি, কর্মী, নারীদের তৃনমূল সংগঠন, ক্যাথলিক দল, তরুণ-তরুণী এবং তারকাদের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে এক বিশাল আন্দোলনের ভিত্তি তৈরি করেছে। ধর্ষণের ক্ষেত্রে গর্ভপাতকে নিরাপরাধিকরণে শুধুমাত্র "গুটি কয়েকজন" নারীবাদী নয়, বরং বৃহৎ পেরুভিয়ান সমাজ থেকে ব্যাপক সমর্থন পায়। এই প্রচারাভিযান নিচ থেকে উপরে (পেরুভিয়ান জনসাধারণের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে) এবং উপর থেকে নিচে (টিভি অ্যাড সেলিব্রিটিদের, শিল্পী, এবং রাজনীতিবিদ ও সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করে) দুই ধরনের কৌশলের সম্মিলনেই করা হয়েছে। সমিতির সাথে একত্রে যেমন আলফম্বরা রোজার (লাল গালিচা), প্রদর্শনী এবং মেলার জন্য সমর্থক নিয়োগ দেয়া হয়। যখন পরিস্থিতি এমন যে, রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর উপর আস্থা কমেছে, সেক্ষেত্রে এই প্রচারাভিযান নাগরিক সম্পৃক্ততার উপর জোর দিয়েছে। ফলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কর্মীদের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র কার্যকর হয়েছে।

এ পর্যন্ত নীতি নির্ধারকদের দিক থেকে কোন জোড়াল সাড়া মেলেনি এবং নতুন কাঠামো সফল হতে পারেনি। উদাহারণস্বরুপ, পেরুতে ধর্ষণের কারণে গর্ভপাতের অনুমতির জন্য পেরুভিয়ান সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ বিফলে যায়। একইভাবে, একটি মহাসমাবেশ সংক্রান্ত বিল স্থগিত হয়ে পড়ে, যেটি ধর্ষণজনিত গর্ভধারণের ক্ষেত্রে গর্ভপাতকে নিরাপরাধ বলে পাস হত। আপাতদৃষ্টিতে, বেশীর ভাগ নীতি নির্ধারকগণ সেই সমস্ত শারীরিক নির্যাতনের জন্য সহানুভূতিশীল হন যখন শরীরে আঘাতের কালো দাগ দেখা যায় এবং হাড় ভেঙ্গে যায়। শারীরিক নির্যাতনের ফলে গর্ভধারণ করলে প্রশ্ন আসে-কার অধিকার রক্ষা হবে? এবং কি নৈতিকতার বিষয়টিও চলে আসে।

তারপরও সাম্প্রতিককালে সরকারের নীতিমালায় কিছু পরিবর্তন হচ্ছে। ১৯২৪ সালে, পেরুভিয়ান পেনাল কোড অনুযায়ী যদি গর্ভবতী মায়ের জীবনের ঝুঁকি থাকে তাহলে তাঁর থেরাপী গর্ভপাতের কারণ হলে তা নিরাপরাধ গর্ভপাত হবে। কিন্তু এই গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত দেওয়ার ব্যাপারে চিকিৎসকের জন্য কোন বিশেষ নির্দেশনা নেই। ফলে কোন ডাক্তার ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা বাতিল করার নির্দেশনা দিলে তাকে কারাগারেও পাঠানো হতে পারে। নূন্যতম আগামী ৯০ বছর পর্যন্ত ডাক্তারগণ স্বেচ্ছায় যেকোন পরিস্থিতিতে গর্ভপাতে সহায়তা করতে অনিচ্ছা পোষণ করবে।

২০১৪ সালে, যেভাবেই হোক, বহু সমালোচনা থাকলেও বিশেষ করে ক্যাথলিক এবং ইভাঞ্জেলিকালসদের পক্ষ থেকে পেরু অবশেষে একটি চুক্তি করে যে, ডাক্তারগণ ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা বাতিল করার নির্দেশনা দিতে পারবে। এরপরও বাস্তবায়নে বাধা রয়ে যায়: কিছু ডাক্তার গর্ভপাত করতে জানতেন না, নারীরা তথ্য কম জানতেন, ভয় ও লজ্জা এসব বিধি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করত, এমনকি যখন গর্ভবতী নারীর জীবন ঝুঁকিপূর্ণ।

নতুন বিধিমালা গ্রহণ করার যুক্তিটি হয়তো গর্ভপাত অধিকার কাঠামোকে প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নামে উপস্থাপন করার তুলনায় নারীর স্বাস্থ্য বিষয়কে বেশি সফল বলে ইঙ্গিত করে। "Ni Una Menos" আন্দোলন পরামর্শ দেয় যে, পেরুর রাজনৈতিক বিতর্কের সম্মুখে নারীর অধিকারের বিষয়টি আসতে পারে; তবে দেখতে হবে যে, সেটি কতটা পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। বিশেষ করে নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়টিকে কিভাবে সমাধান করে তা দেখা বাকি রয়ে গেল। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
Erika Busse <e.busse@up.edu.pe>

> অগ্রযাত্রা: আরব বিশ্বে সামাজিক বিজ্ঞান

মোহাম্মদ এ. বামিয়েহ, পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ইউএসএ, সম্পাদক, *ইন্টারন্যাশনাল সোশিওলজি রিভিউস* ও আইএসএ-এর সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও গবেষণা (আরসি৩৬) ও জীবনী ও সমাজ (আরসি৩৮) বিষয়ক গবেষণা কমিটির সদস্য

"নতুন জ্ঞান নতুন সময়ের জন্যে"-এটা সম্প্রতি প্রকাশিত প্রতিবেদনের *Social Sciences in the Arab World: Forms of Presence*-এর (http://www.theacss.org/uploads/English-ASSR-2016.pdf)[১] উদ্দেশ্যকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। আরব কাউন্সিল ফর দ্য সোশ্যাল সায়েন্স (এসিএসএস)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিবেদনটির তথ্য যোগান থেকে শুরু করে তৈরি করা পর্যন্ত একটি গবেষক দলের প্রায় দুই বছর সময় লেগেছে। এই প্রতিবেদনে ব্যবহৃত সকল উপাত্ত মৌলিক, যা প্রথমবারের মত কোন প্রকল্প দলের দ্বারা সংগৃহীত হয়েছে।

আরবের সকল বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা কেন্দ্র, পেশাভিত্তিক সংগঠন ও জ্ঞানভিত্তিক সাময়িকীতে সামাজিক বিজ্ঞানের আকৃতি ও প্রকৃতির উপর প্রকাশিত গুণগত ও পরিমাণগত উপাত্তের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়; এটা বহুলাংশে গণমুখী সামাজিক বিজ্ঞানের মত। গবেষণাটি মূলত কীভাবে বেসামরিক সামাজিক সংগঠনগুলো সামাজিক বিজ্ঞানের কাজে লাগায় এবং আরবের সার্বজনীন পরিমণ্ডলে সামাজিক বিজ্ঞান কতটা কাজ করছে তার উপরে আলোকপাত করে উপাত্ত সংগ্রহ করেছে। বিশেষ করে সংবাদপত্র, টেলিভিশনের অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সাময়িকী ও জনপ্রিয় ম্যাগাজিনগুলো এসকল উপাত্তের উৎস।

আমরা গত দুই তিন দশক ধরে আরব অঞ্চলে ২২টি দেশে সামাজিক বিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক ক্রমবর্ধমানতার কারণগুলি চিহ্নিত করেছি। হাউজিং সোশ্যাল সায়েন্সেসের ক্রমবর্ধমানভাবে গড়ে ওঠার দলিলাদি সংগ্রহ করেছি। বর্তমানে আরব অঞ্চলের প্রায় ৭০ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় নব্বইয়ের দশকের গোড়া থেকে শুরু হয়েছে, আরবের জ্ঞানভিত্তিক সামিয়িকীগুলো আশির দশক থেকে চারগুণ বেড়েছে এবং একই সাথে এখানকার গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো বৃদ্ধি পেয়ে ছয় গুণ হয়েছে। গত দুই তিন দশক ধরে আরব বিশ্বে এই নিরব বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যাচ্ছে যদিও আমরা এ বিপ্লবের কারণ সম্পর্কে জ্ঞাত নই।

মজার ব্যাপার হল, জ্ঞানের এই প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রসারণ একটি স্বাধীন জাতীয় সম্পদ হিসেবে আবির্ভূত হতে শুরু করেছে। এক্ষেত্রে আমরা ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোকে একইভাবে দেখতে পারি। সম্পদের তুলনায় আরও কতগুলো বিষয় বেশ গুরুত্বপূর্ণ যেমন: গবেষণায় স্বাধীনতা, একটি তুলনামূলক শক্তিশালী সুশীল সমাজ যারা কি না সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণাকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি-এর থেকে উপযোগিতা লাভ করার চেষ্টা করে; কোন দেশের স্থানীয় উন্নয়নে আন্তর্জাতিক মান আনয়ন এবং বৈশ্বিক সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে স্থানীয় জ্ঞানভিত্তিক জনসমষ্টির শক্তিশালী সম্পর্ক স্থাপন করে। সুশীল সমাজের বেড়ে ওঠার সঙ্গে সামাজিক বিজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উভয়টিই আরবের উত্থানের পেছনে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সংশ্লিষ্ট করে । এটা ২০১০ সালে শুরু হয় এবং এর কারণ এখনও অপ্রকাশিত।

আরবের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতিবেদনে ব্যাপক ভারসাম্যহীনতা লক্ষ করা যায়। অর্থনীতি আরবের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সামাজিক বিজ্ঞানের প্রধান শাখা হিসেবে বিবেচিত হয়, যা সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের চারভাগের একভাগ দখল করে রেখেছে। এক্ষেত্রে প্রায় শতকরা ২ ভাগ অংশেও নৃবিজ্ঞান পাওয়া যায় না। এছাড়া অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ এই দুইটি থেকেও প্রান্তসীমায় অবস্থিত ।

অধিকাংশ আরবের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। এ থেকে বোঝা যায়, যেসব সমাজ গবেষক গবেষণা ও সচেতনতামূলক কাজে নিয়োজিত হতে চায় তারা খুব সামান্য সময় ও অল্প পরিমাণে অনুদান পায়। দ্বিতীয় ধাপের কাজগুলো আরবের গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানগুলো করে থাকে। কেননা তারা জ্ঞানের প্রতি সুসংগঠিত না থেকে প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রতি বেশি জোর দেয় এবং জ্ঞানের আন্ত:শাখাকে নাগরিক সম্পৃক্ততার সাথে উন্নীত করে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যেগুলো সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিষ্ঠিত, সেগুলো বিদ্বৎ ক্ষেত্রে উৎপাদনক্ষমতা নির্দেশ করে। বর্তমানে তারা আরব বিশ্বের জ্ঞাননির্ভর সাময়িকী প্রকাশ করে চলেছে। লেবানন, ফিলিস্তিন ও জর্ডানে তাদের জনসংখ্যার তুলনায় অধিক সংখ্যক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। এমনকি এক্ষেত্রে কাতার ও বাহরাইনের মত সম্পদশালী দেশের মত জিবুতিও এগিয়ে রয়েছে।

মজার ব্যাপার হল, কুয়েত ও সৌদি আরবের মত দেশে মাঝামাঝি ধরণের গবেষণার নজিরও নেই। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখতে পাই যে, সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সূচকগুলো সত্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, বরং আমাদের গবেষণা থেকে দেখতে পাই যে, ইউরোপিয়ান ভাষা ও জ্ঞানের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা আরব বিশ্বের জ্ঞান চর্চাকে অনেক পশ্চাৎপদ করে রেখেছে। এ ধরনের সূচকের মাধ্যমে মান নিরূপণ জ্ঞান চর্চার মুল উদ্দেশ্য থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বিন্যাসের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে; ফলে উৎপাদিত জ্ঞান সমাজের যথাস্থানের উপযোগিতা হারাচ্ছে।

সামাজিক বিজ্ঞানের অর্ধেকের বেশি প্রতিবেদনই সার্বজনীন পরিমণ্ডলের প্রতি মনযোগী। সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ, জনপ্রিয় ম্যাগাজিন, টেলিভিশনের অনুষ্ঠানসূচী এবং সাংস্কৃতিক সাময়িকীগুলোর উপর বিশ্লেষণধর্মী গবেষণাগুলো থেকে দেখা যায়, সামাজিক বিজ্ঞান প্রায়শই সংক্ষিপ্ত কাঠামো, বিন্যাস সূচক এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে তথ্য উপাত্ত প্রকাশ করে। এ গবেষণাটি প্রকাশ করে যে, যেকোন সুশীল সমাজই সমাজলব্ধ জ্ঞান উৎপন্ন করে-যা তাদের লক্ষের সাথে যতই অযৌক্তিক হোক না কেন। সাম্প্রতিক সময়ের বিবেচনায় সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, আরবের সামাজিক বিজ্ঞানের ব্যাপকতা এবং সুশীল সমাজের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির মধ্যে সম্পৃক্ততা রয়েছে। অন্যান্য জনসামাজিক পরিমণ্ডলের একমাত্র সাংস্কৃতিক সাময়িকই সামাজিক গবেষণার জন্য কিছুটা উন্মুক্ত। তাদের সম্পূর্ণ সাময়িকীর ২০ ভাগ জুড়ে সামাজিক বিজ্ঞানের প্রবন্ধগুলো প্রকাশিত হয়; যদিও তাতে সাংস্কৃতিক কার্যাবলী যতটা গুরুত্ব পায় সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষা ও গবেষণামূলক কাজগুলো

>>

"সামগ্রিক সামাজিক রূপান্তর আরবের সামাজিক বিজ্ঞানীদের কাছে অগ্রাধিকার পেয়েছে"

ততটা গুরুত্ব পায় না। অন্যদিকে, সংবাদপত্র, জনপ্রিয় সাময়িকী, টেলিভিশন অনুষ্ঠানসূচী সামাজিক বিজ্ঞানের প্রতি স্বল্পসময় ও কম গুরুত্ব দেয়। এসব প্রতিবেদনের সত্যতা ও গুনগত মান খুব নিম্ন যার দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই ফিলিস্তিনি সংবাদপত্র *আল-কুদস* ও কুয়েতের জনপ্রিয় সাময়িকী *আল-আরাবি*-তে।

সামগ্রিকভাবে সামাজিক পরিবর্তন, এটা বিপ্লবধর্মী বা সংস্কারমূলক যা-ই হোক না কেন, এটা আরবের সামাজিক বিজ্ঞানীদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিশেষ করে বিগত পাঁচ বছরের জন্যে (জানুয়ারি ২০১০-ডিসেম্বর ২০১৪)। এসময়ে আমাদের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে, "আরব বসন্ত" আরবের সামাজিক বিজ্ঞানীদের সচেতনতার জায়গা থেকে অগ্রসরমান। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়গুলো হল- "গণতন্ত্র", "অধিকার", "স্বৈরশাসন", "অংশগ্রহণ", "নাগরিক সমাজ", আরও অনেক কিছু। প্রতিবেদনটি থেকে আরও পাওয়া যায় যে, নারী সংক্রান্ত প্রশ্নটি সর্বকালের সর্বক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, "প্রচলিত" বিষয়- পরিবার, সন্তানের চেয়ে অধিকার, নাগরিকতা ও অংশগ্রহণের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলো অগ্রাধিকার পায়। গবেষকদের কাছে সামাজিক পরিবর্তনের কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্র যেমন- "যৌবন", "শিক্ষা", এমনকি "উন্নয়ন"-এক্ষেত্রে কমবেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। মজার বিষয় হল, কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার একেবারে অনালোচিত-বিশেষ করে "মুসলিম বিশ্ব"। পশ্চিমে এই ধারণাটি যখন একটি বিশ্লেষণাত্মক বিষয় হিসেবে গুরুত্ব পেতে শুরু করে, আরবের সামাজিক বিজ্ঞানীরা একে উপেক্ষা করে যায়। এর কারণ হিসেবে অনুমান করা যায় যে, তারা "মুসলিম বিশ্ব"-কে একটি অর্থপূর্ণ বিশ্লেষণধর্মী উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেন না। এমনকি তারা "ইসলাম" ও ধর্মীয় রাজনীতিকেও সামাজিক বিজ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ করে থাকে।

এই প্রতিবেদনের আলোকে বলা যায় যে, প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী আরবের নীতিনির্ধারকেরা তাদের গবেষণাকে উপেক্ষা করা সত্ত্বেও আরবের সামাজিক বিজ্ঞান সাম্প্রতিক সময়ের জ্ঞান চর্চার ধারাবাহিকতায় ধীরে ধীরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে তুলছে। এছাড়া প্রতিবেদন অনুযায়ী ভবিষ্যতে আরবের সামাজিক বিজ্ঞান বৈশ্বিক সামাজিক বিজ্ঞানে তাদের অবদান ও তাদের অঞ্চলের ভবিষ্যৎ কোন দিকে যাবে, এদিকে লক্ষ্য রেখে প্রতি দুই বছর পরপর তারা পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
Mohammed Bamyeh <mab205@pitt.edu>

[১]সম্পাদকীয় টিকা: মোহাম্মদ বামেহ এখানে উল্লেখিত প্রতিবেদনটির লেখক।

> সামাজিক বিজ্ঞানের নতুন পরিকাঠামো

আরব অঞ্চল

সেতেনি শামি, মহাব্যবস্থাপক, আরব কাউন্সিল ফর দ্য সোশ্যাল সায়েন্সেস, লেবানন

২০১৫ সালের মার্চে আরব কাউন্সিল ফর দ্য সোশ্যাল সায়েন্সেস কতৃক আয়োজিত দ্বিতীয় সম্মেলন।

আরব অঞ্চল সামাজিক-অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, রাজনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত হুমকির মুখোমুখি হতে শুরু করেছে। একই সঙ্গে এর একটি শক্তিশালী শিক্ষায় ও গবেষণায় সামর্থ্যের ঘাটতি রয়েছে। এই নিবন্ধটি এই প্রতিকূলতাকে নানা রূপে মূর্ত করে তোলে। সামাজিক পরিবর্তনকে বিশ্লেষণ ও গণমুখী বাদানুবাদকে আরও সক্রিয় করে তোলা কিংবা গণমানুষের নীতি প্রণয়ন করার প্রতিকূলতাকে সামনে নিয়ে আসে। জাতিসংঘ মানব উন্নয়নের বিভিন্ন প্রতিবেদনে আরবের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে এটা প্রতীয়মান হয়ে ওঠে যে, আরব অঞ্চলের জন্যে জ্ঞান অনস্বীকার্য। যা অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন সামর্থ্য, উৎকর্ষ, ব্যাপ্তি, প্রসারণ ও গবেষণায় প্রভাব বিস্তার করতে সহায়ক হয়ে উঠবে। বিশেষ করে এ অঞ্চলে সামাজিক বিজ্ঞানের ব্যাপ্তির জন্য গবেষণা আবশ্যক।

বিগত সময়ের প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা সচে-

>>

তনতা এ সকল হুমকিকে মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণকে ত্বরান্বিত করেছে। উচ্চ শিক্ষার নতুন প্রাতিষ্ঠানিক ও গবেষণা ক্ষেত্র গড়ে উঠছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের স্নাতকে অধ্যয়ন করার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ফেলোশিপের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শিক্ষা ও গবেষণায় অবদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সম্মাননা দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। ধীরে ধীরে পেশাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠছে। তবে সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত যে সকল কার্যক্রম ও সুযোগ রয়েছে, তা ক্রমেই কমে আসছে। এক্ষেত্রে সারা আরব অঞ্চলে এখনও সুযোগগুলো অপ্রতুল।

আরবের সামাজিক বিজ্ঞানীরা ২০০৬ সালে প্রথমবারের মত আরব অঞ্চলে সামাজিক বিজ্ঞান ও সামাজিক গবেষণার সমস্যাগুলো উত্থাপন করেন। এই প্রেক্ষাপটে, আরবের সামাজিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে আরব কাউন্সিল ফর দ্য সোশ্যাল সায়েন্সেসের চিন্তা সামনে আসে। তাঁরা এটাকে রূপ দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যাবতীয় কর্মতৎপরতা শেষে ২০১০ সালে আরবদের নবরূপে উত্থান ঘটে। অন্য সকল কিছুর মধ্যে এ ঘটনা সাধারণের স্পেস ও এ সংক্রান্ত বিতর্ককে উন্মুক্ত করতে এবং একই সঙ্গে আশা ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। এর মাধ্যমে, স্থিতিবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা এবং সমাজের জন্য নিত্যনতুন সম্ভাবনার অত্যাবশীয়কতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে অতীত, বর্তমান অও ভবিষ্যতের নতুন কর্মপন্থাগুলো প্রতিফলিত হতে থাকে।

এ উদঘাটিত ফলাফলের সঙ্গে পুনরুজ্জীবিত স্বৈরতন্ত্র, বর্ধিত অনিরাপত্তা, সহিংসতা ও বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘটিত যুদ্ধের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। যাহোক যে বীজগুলোর অঙ্কুরোদগমের জন্য বপন করা হয়েছিল, সেগুলো নজরদারি ও নিপীড়নের মধ্য দিয়েও নিজেদের আত্মরক্ষা করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক পরিসর বর্ধিত হচ্ছে এবং সারা জাগানো উদ্যোগগুলো গবেষণার সক্রিয়তা এবং গবেষণা-গণমুখী পরিসর নির্মাণের যোগসূত্রের মধ্য দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব তৈরির নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে। একই সঙ্গে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার নতুন নতুন সুযোগ বিকশিত হচ্ছে (যেমন-অনলাইন কোর্স, সামষ্টিক পঠনপাঠন, বা বেসরকারি "শিক্ষায় প্রবেশ")। অবাধ অনুসন্ধান ও আলোচনার জন্য ভবিষ্যতে এ অঞ্চলে সামাজিক বিজ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরিকরণ ও তার সুরক্ষার প্রয়োজন।

> দ্য এসিএসএস

দ্য আরব কাউন্সিল ফর দ্য সোশ্যাল সায়েন্সেস (এসিএসএস) একটি অলাভজনক ও সদস্যবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান। এর প্রধান সদর দফতর লেবাননের বৈরুতে অবস্থিত। এটি মূলত সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণাকে সমগ্র আরব অঞ্চল ও বৈশ্বিকভাবে ছড়িয়ে দিতে কাজ করে। বর্তমানে এর চতুর্থ বছর পূর্তি হয়েছে। দ্য এসিসিএস-এ এখন সাতজন স্থায়ী ও দুইজন অস্থায়ী কর্মকর্তা কাজ করছেন। এর একটি কেন্দ্র ফিলিস্তিনে। এই কেন্দ্র একজন অস্থায়ী বুজর্গ পরামর্শকসহ আরও কয়েকজন অস্থায়ী প্রশাসনিক ও অর্থসংক্রান্ত কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালিত হয়। দ্বিতীয় কেন্দ্রটি আলজেরিয়াতে। একই রকম পরিকল্পনায় সিনিয়রের অধীনে। দ্য এসিসিএস গবেষণা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে চারটি অনুদানের প্রোগ্রাম চালু করেছে। এগুলোর মধ্যে একটি দ্বিবার্ষিক সম্মেলন, দ্বিবার্ষিক গবেষণা ফোরাম (গ্রাহকদের জন্য), একটি বার্ষিক বক্তৃতামালা ও একটি সক্রিয় ওয়েবসাইট ও প্রচার কার্যের জন্যে সামাজিক গণমাধ্যম অন্যতম। এ কাউন্সিল ১৩০ জনের অধিক গ্রাহক, ২৭০ জন সদস্য ও সম্মেলনে অর্থ সাহায্য প্রদান করে এবং সদস্য, গ্রাহক ও সামাজিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রশিক্ষণ ও নেটওয়ার্কিং-এর সুযোগ তৈরি করে দেয়।

আরব অঞ্চলের আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও ২০০৮ সালের এসিএসএস তার কাজের ব্রত, লক্ষ্য ও মূল্যবোধগুলো যুক্তিসঙ্গত ও জরুরি বিষয় হিসেবে নীতিমালা আকারে নির্ধারণ করে। (দেখুন http://www.theacss.org/pages/mission)। এসিএসএসের নীতিমালায় এ অঞ্চলের সামাজিক গবেষণা ও চিন্তায় উৎকর্ষ, অন্তর্ভুক্তি, নমনীয়তা ও স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। এরপর এসিএসএস এ অঞ্চলের সামাজিক বিজ্ঞানীদের, বিশেষ করে পিএইচডি করছে এমন তরুণ পণ্ডিত বা পোস্ট ডক্টরাল পর্যায়ে উন্নীত পণ্ডিতদের প্রয়োজন, ও সুযোগদানের ওপর গুরুত্বারোপ করে।

এসিসিএসের অন্যতম প্রকল্প হল আরব সামাজিক বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ প্রকল্প (এএসএসএম)। এটা অঞ্চল ভিত্তিক সামাজিক বিজ্ঞানের হাল বিশ্লেষণ করে। এর প্রথম প্রতিবেদন হল, "*Social Sciences in the Arab Region: Forms of Presence*"। ড. মোহাম্মদ বামিয়েহ এটা উপস্থাপন করেন। তিনি এই অঞ্চলের প্রাতিষ্ঠানিক ও স্বতন্ত্র রূপ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেন (http://www.theacss.org/uploads/English-ASSR-2016.pdf)। তাঁর আলোচনায় সামাজিক বিজ্ঞানের বিভাগ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর আঞ্চলিকভাবে বেড়ে ওঠাকে স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হয়। এ প্রতিবেদন থেকে এম.এ ও পিএইচডি প্রোগ্রাম, জার্নাল, ব্যাপকভাবে উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য পরিকাঠামো ও পাণ্ডিত্যের ব্যাপকতার জন্যে পেশাভিত্তিক সংগঠনের অপ্রতুলতা প্রতীয়মান হয়। তবে এর একটি বড় ইতিবাচক দিক হল, এ প্রতিবেদনে এটাও বর্ণিত হয় যে, গণপরিসরে, বিশেষ করে সাহিত্য কর্ম, সংবাদপত্র, জনপ্রিয় জার্নালগুলোতে যে সামাজিক বিজ্ঞানের ও পাণ্ডিত্যের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি আছে, তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

> আরবের সামাজিক বিজ্ঞান: প্রান্তিক না অগ্রসরমান?

আরব অঞ্চলে সামাজিক বিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক এ নেতিবাচকতা উন্নয়ন ও আধুনিকতার স্বরূপকে তুলে ধরে। এগুলো শিক্ষা, মানব-হিতৈষী পরিকল্পনায় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে বিগত দশকগুলোতে প্রচলিত কেন্দ্রীয় বিষয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং প্রকৌশল থেকে সরে গিয়ে অর্থশাস্ত্র, ব্যবস্থাপনা, এবং বেসরকারি খাত অনুসারে বিচিত্র রূপ লাভ করেছে। সামাজিক বিজ্ঞানের এই দশা ও হাল উভয়ই এ অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি তুলে ধরে। বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ঘাটতির ওপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করে। এখানে মানের উৎকর্ষের বিনিময়ে শিক্ষায় তালিকাভুক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেসরকারিভাবে উচ্চশিক্ষার এই প্রবৃদ্ধি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ এর সামাজিক বিজ্ঞানকে প্রান্তে ঠেলে দিয়েছে ও অসমতা সৃষ্টি করছে। একই সময়ে, সরকারি নীতিমালায় একাডেমিক আলোচনার পথ রুদ্ধ হচ্ছে। নীতিনির্ধারকরা সামাজিক বিজ্ঞানীদের গবেষণা প্রশ্ন নিয়ে দোষারোপ করে বলেন যে, এগুলো নীতির জন্যে অপ্রাসঙ্গিক এবং আরেক দিক থেকে সামাজিক বিজ্ঞানীরা অভিযোগ করেন যে, নীতিনির্ধারকরা গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলকে উপেক্ষা করে।

এক্ষেত্রে ব্যাপার হল শিক্ষা নীতি, উন্নয়নের ধারণা, সাধারণের পরিসরে সীমা আরোপের বিষয়গুলো একেবারেই চ্যালেঞ্জমুক্ত। বলতে গেলে, এটা ঐ অঞ্চলের সামাজিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দুর্বলতা। এটা একটি স্বশাসিত বুদ্ধিদীপ্ত পরিসরে তিনটি অপরিহার্য ক্রিয়া: আধিপত্য ও আদর্শিকতার এজেন্ডা হিসেবে প্রমাণভিত্তিক বিকল্পের সক্ষমতাকে, এবং নীতি নির্ধারণে গণ মানুষের আলোচনাকে প্রভাবিত করার সক্ষমতাকে, পেশাজীবীদের স্বার্থকে সংরক্ষণ ও তাদের মর্যাদা উন্নীত করতে পারার সক্ষমতাকে একীভূত না করতে পারার অক্ষমতাও বটে। এটা একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার কারণ হল, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, আরবের সামাজিক বিজ্ঞানীরা দেশিও পরিমণ্ডলে বা বৈশ্বিক জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হতে সক্ষম হয়ে ওঠেনি। আরবের সামাজিক বিজ্ঞানের কমিউনিটির একটি বড় অংশ আন্তর্জাতিক ফোরাম ও সক্রিয় গবেষণার নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। ফলে বৈশ্বিক জ্ঞান উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাঁরা কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

এসিএসএস প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ক্রমবর্ধমানভাবে অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে

>>

তাঁর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসলেও তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য হল এসকল বিষয়গুলোর দিকে নজর দেওয়া। ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া ও ইয়েমেনে ধীরে ধীরে সংঘর্ষ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার পরিবেশ মিশরের চেয়ে আরও আশংকাজনক হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে পণ্ডিত ও সক্রিয় কর্মী-দের ওপর নজরদারি ও হুমকি বেড়েছে। এটা এসিএসএস-এর আঞ্চলিকভাবে ছাপিয়ে যাওয়াকে প্রতিহত করেছে। বিভিন্ন দেশে-এর কার্যক্রম সংঘটনকে ব্যাহত করেছে। এছাড়া, এসিএসএস-এর কুশীল-বরা কিছু কিছু দেশের ক্ষেত্রে কার্যক্রম সম্পাদন করতে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনায় পরিবর্তন এনেছে। কখনো কখনো তাদের প্রকল্পের মাঠগবেষণার উপাদান কমিয়েছে। সর্বশেষে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার ক্ষেত্রে এটা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভিসার জন্যে আরও প্র-য়োজনীয় তথ্য নির্দেশ ও পরিভ্রমণে নিষে-ধাজ্ঞা জারি হয়েছে।

এ সকল সমস্যা থাকা সত্ত্বেও-বা, তাদের কারণে-এটা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ যে, এসিএসএস অঞ্চলের গবেষকদের সমর্থন ও সুযোগের ব্যবস্থা করে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে থাকে। এবং এটিকে আরও বৃহৎ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। আমরা গ্রাহকদের স্থিতি-স্থাপকতা ও তাদের গবেষণা প্রকল্প এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে দৃঢ় সংকল্প দেখে আনন্দিত। লক্ষ্য করা যায়, অনেক প্রোগ্রা-মের প্রার্থী ও অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী আর দোলাচলে নেই। তারা এসিএসএস-এর উত্থান সম্পর্কে আশাবাদী। লেবানন এরকম একটি কেন্দ্র যে, যেখানে সাধার-ণত আঞ্চলিক মিথস্ক্রিয়া ও একাডেমিক স্বাধীনতার পরিবেশ বজায় রাখতে সহায়তা করা হয়। এসিএসএস পরিবর্তিত পরিস্থি-তিতে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ও এর প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধের প্রতি অংগীকারবদ্ধ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি ও কা-র্যক্রম সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অতন্দ্র প্রহরী।

আমরা এসিএসএস-কে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সহায়তার পথ ও নেটওয়ার্ক সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আরবের সামাজিক বিজ্ঞানকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার মাধ্যম হিসেবে দেখার আশাবাদ ব্যক্ত করছি। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
Seteney Shami <shami@theacss.org>

> আরব সামাজিক বিজ্ঞান

আরব বসন্ত পূর্ব ও পরবর্তী অবস্থা

ইদ্রিস জেবারি, আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়, বৈরুত, লেবানন

সামাজিক বিজ্ঞানের জন্য আরব বসন্ত কী ধরণের বৈচিত্র্যতা তৈরি করেছে।

আরব বিশ্বে সামাজিক বিজ্ঞানের অবস্থা প্রতিপন্ন করে লিখিত প্রথম প্রতিবেদনটির আলোকে সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক বামিয়েহ আরবের সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ক যে ধাঁধাগুলি তৈরি হয়েছে তা সমাধান করার চেষ্টা করেন। জ্ঞানের এই শাখাটি আপাতদৃষ্টিতে ঐতিহাসিকভাবে দুর্বল যেখানে জটিল সামাজিক বাস্তবতা ও আবেগপূর্ণ মনোভাব পাশাপাশি অবস্থান করে। আরব বসন্তের পর পাঁচ বছর কেটে গেছে; আরবের এই পরিবর্তনের ফলে জ্ঞানের শাখাগুলিতে কতটা প্রভাব পড়েছে তা অনুসন্ধানের জন্য যে সময়ের ব্যবধানের প্রয়োজন ছিল সেখানে আমরা পৌছে গেছি। আরবের সামাজিক বিজ্ঞান যে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে এ প্রতিবেদনটিতে তা কীভাবে দেখানো হয়? আরবের জনসাধারণের সম্পৃক্ততার যে ধারা তৈরি হয়েছে তা থেকে আরবের তরুণ সামাজিক বিজ্ঞানীরা কী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে?

>>

> আরবের সমাজিক বিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জসমূহ

পণ্ডিত, অনুশীলনকারী ও শিক্ষার্থীরা আরবের জ্ঞান উৎপাদনের শাখায় যে নিম্নমুখী অগ্রসরমান তা সম্পর্কে ভালভাবে জানেন। এ প্রতিবেদনে বামিয়েহ প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো, যা জ্ঞানের শাখাগুলোকে পরিপূরণতা দান করে তারই আলোকে বৈশ্বিক সমন্বয়তার ত্রুটি কিংবা রাজনৈতিক অস্থিরতাকে একটি প্রচলিত সিদ্ধান্তের আওতাধীন করেন। তিনি "বিচ্ছিন্নতাবাদ"-কে গুরুত্ব না দিয়ে বলেন, আরবের সমাজিক বিজ্ঞানীদের "দুর্বল যোগাযোগ কাঠামো " ও "তাদের পূর্বসূরিদের সাথে সম্পর্কের ঘাটতি"-এর শিকার। মোটা দাগে, আরবের সামাজিক বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য এক্ষেত্রে বৈশ্বিকভাবে একটি স্থান করে নেওয়া নয়, বরং তাদের নিজেদের গবেষণার বিষয়কে বিশ্লেষণ করা ও এটির সঙ্গে জাতীয় নীতিতে এ গবেষণার প্রতিফলন ঘটানো। বর্তমানের যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জ্ঞানের এই শাখাকে ঘিরে রেখেছে তা হল সমাজ ও বাজারের মূল্য এবং উপযোগিতা।

প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্বের এই জায়গাটি সার্বজনীনতা ও সুনির্দিষ্টতার মধ্যে বিরাজমান চাপা উত্তেজনার ভিতর দিয়ে আরববিশ্বে সামাজিক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। বামিয়েহ এক্ষেত্রে প্রেক্ষাপটের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। বামেহ বিগত দশকগুলোর পঠনপাঠনের আলোকে একটি সুনির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করে সাম্প্রতিক সময়কে তুলে ধরেন। বিগত সময়ের পঠন-পাঠনের ধারা থেকে তিনি দেখান যে, আরব বিশ্বের এ জ্ঞানশাখা পশ্চিমা সামাজিক বিজ্ঞানের সঙ্গে একীভূত চিন্তা সহযোগে বিকশিত হয়েছে। বামেহ আরবের সামাজিক বিজ্ঞানের "সুনির্দিষ্টতা" ও গবেষণা পদ্ধতিতে এর প্রভাবকে পাশ কাটিয়ে যান; কারণ তারা আরবের সামাজিক বিজ্ঞানীদের জন্য তাত্ত্বিক দিকটিকে জারি রাখেন। (যেমন- গেলনার ও তাঁর আদিবাসী সম্পর্কিত কাঠামোর বিপরীতে তারা বরদু-এর শ্রেণি সংক্রান্ত সমাজতত্ত্বের সমর্থন করে, তাদের মধ্যে বিরোধ সংক্রান্ত যে চলমান উত্তেজনা)। এখনও এই পছন্দ এ অঞ্চলের সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণাতে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। আরবের সামাজিক বিজ্ঞান এক্ষেত্রে বিদেশি প্রকাশনার প্রতি কৃতজ্ঞতার দাবি রাখে। এটা তাদের গবেষণাকে ভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরে। সেটা বিষয় কিংবা পদ্ধতিগতভাবে হোক না কেন।

এই প্রতিবেদন সম্পর্কিত বামেহের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি হল, পদ্ধতিগত বিষয় হিসেবে "একক বিশ্লেষণ"-কে তুলে ধরা। এটা কী আরবের সামাজিক প্রপঞ্চগুলোর বিমূর্ত গবেষণা হিসেবে কিংবা সামগ্রিকভাবে আরবের গবেষণা করার মাধ্যমে একটা অর্থ সৃষ্টি করে, এরপর কী স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নেয়া কোন একটি একক সিদ্ধান্তের ভিত্তি থেকে সার্বজনীন একটা সিদ্ধান্ত টানা যায়? তিনি দেখান যে, ১৯৮০ সালের দিকে সমগ্র আরব বিশ্বের সামাজিক বিজ্ঞানে "ইসলামিকরণ" ছড়িয়ে পড়ে। এরপর তার আলোচনায় সৌদি আরব সম্পর্কিত বিষয় প্রাণ পায়। যেখানে উল্লেখ্য এ যুক্তিগুলো প্রতিফলিত হয়। তাঁর যুক্তিতে, নিজের দেশে যথাযথগ গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও সামাজিক সংঘর্ষ বা প্রবাসের শ্রম গবেষণা সম্পর্কিত বিষয় আলোচনার আগে পরিবারে গুরুত্বের জায়গা ও অপরাধবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে মতামত ব্যক্ত করা আবশ্যক। একইভাবে, বামিয়েহ আরব জার্নালগুলোর বিষয়ের আলোকে মোক্তার এল হারাছ-এর পটভূমি আলোচনার উপর আলোকপাত করেন। হারাছ-এর আলোচনা থেকে আরবের সাংস্কৃতিক জার্নালগুলো কীভাবে ভূমিকা পালন করে, তার একটি দেশীয় তুলনামূলক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাঁর আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শতকরা ৬৮ ভাগেরও অধিক জার্নালের আলোচনার ভিত্তি হল তাত্ত্বিক রূপরেখা । তিনি এক মন্তব্যে জানান, এই জার্নালগুলো বিস্তর আরব অঞ্চলের আলোচনা তুলে না ধরে, বরং যে অঞ্চলকে নিয়ে কাজ করা হয়, সে অঞ্চলের মধ্যে সীমিত রাখা হয়। এক্ষেত্রে তিনি এই নানামুখী ফলাফলের পেছনে যুক্তিসঙ্গত কোন ব্যাখ্যা নির্দেশ করেননি। একইভাবে, "রিসার্চ ডেনসিটি" পরিভাষাটি (একটি দেশের আপামর জনসাধারণের বিভাজন অনুসারে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপ্তি) আরব বিশ্বকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করতে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে "সাধারণ পরিবেশ-পরিস্থিতি তাদেরকে প্রতিপালিত করা", ব্যাপারটি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে " সামাজিক বিজ্ঞানে আগ্রহ সৃষ্টির" একটি ব্যাখ্যাযোগ্য উপাদান হিসেবে গণ্য হতে পারে। লেখক এক্ষেত্রে একটি বড় পরিসরের কার্যসাধন, তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে উদ্দীপনা ও চাপ প্রয়োগকে তুলে ধরেন। তবে তিনি সবকিছুর পেছনে যে সুক্ষ্ম সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলো থাকে সে সম্পর্কে আলোচনা করেননি।

লেখকের সমতিক্রমে, প্রতিবেদনের প্রয়োজনে করা "জরিপগুলো"-এর বর্তমান অবস্থা, কতগুলো প্রকাশনার ভূমিকা হিসেবে সাজানো হয়েছে। যা বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করবে। বিশেষ করে ২০১০-২০১৫ পর্যন্ত সময়কালকে তুলে ধরবে এবং এর সঙ্গে গবেষণার পুস্তক বিবরণীও যুক্ত করবে। প্রতিবেদনটি তার সীমাবদ্ধতা দ্বারা পরিবেষ্টিত হলেও এটা এই জ্ঞানশাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলোকে চিহ্নিত করে নতুন প্রাণ দেবে।

> সামাজিক বিজ্ঞান এবং আরবের সামাজিক বিজ্ঞানের পরিবর্তন

বামিয়েহ-এর সামাজিক বিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোভিত্তিক জরিপটি এই প্রতিবেদনের জন্য একটি অন্যতম উপাদান। বিশেষ করে এখানে গবেষকদের নিকট প্রশ্ন ছুড়ে দেয়া হয়েছে যে, আরবের সামাজিক পরিসরে যে বড় পরিবর্তন এসেছে তা আদৌ তাদেরকে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি করছে কিনা।

তাঁর উপাত্তগুলোর ভিত্তিতে সামাজিক বিজ্ঞানের "প্রকৃত বাসভূমি" হিসেবে আরবের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দেখানো হয় (শতকরা ৪৮ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞানের প্রোগ্রাম ও ডিগ্রি অন্তর্ভুক্ত)। অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, রাজনীতি বিজ্ঞান এবং ইতিহাস নিয়ে ৪৩৬টি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক, অধিকাংশ দেশে পেশাভিত্তিক সংগঠনগুলোর এবং ২১৭ টি একাডেমিক জার্নালের সাপোর্টে গড়ে ওঠা এ জ্ঞানশাখার একটি ভারসাম্যপূর্ণ বণ্টন এখানে লক্ষ্য করা যায়। তবে উপাত্তগুলো একটি কৌতূহলোদ্দীপক প্রবণতা তুলে ধরে। আরবের সামাজিক বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শিতা রয়েছে ও বৈশ্বিক যোগাযোগে তাদের সক্রিয়তা বাড়ছে। এক্ষেত্রে সমগ্র আরব অঞ্চলের বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আলজেরিয়া ও মিশরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বলে দেখা যাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের এই সংখ্যা আরেক ধরনের বাস্তবতাকে উপজীব্য করে তোলে। আরবের সামাজিক বিজ্ঞানীরা জ্ঞানের উৎপাদনমুখিতা ও পুঞ্জীভবনের অপরিহার্য দিক এবং এগুলোর ছড়িয়ে দেয়া, একটি আরেকটির সঙ্গে সম্পর্কিত করা এবং সামাজিক পরিবর্তনকে সমর্থন করার মাধ্যমে, এদের মধ্যে বিরাজমান উদ্বেগকে মোকাবেলা করে । বামিয়েহ এক্ষেত্রে "ঐতিহ্যগত নয় এমন সক্রিয় উপাদান"-এর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। যেমন- নাগরিক সমাজ। এর ওপর ভিত্তি করে আরেকটি প্রবন্ধের পটভূমি নির্মিত হয় যে, "এনজিও কেবল কর্মসংস্থানই করে না, একই সঙ্গে সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্র উন্মোচিত করে [...] তাদের উদ্দেশ্যের দৃঢ়তাও তুলে ধরে"। একইভাবে এগুলো আরবের প্রতিবেশ বোঝার ক্ষেত্রে একইরকম, বিশেষ করে সমগ্র আরব প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব বোঝার ক্ষেত্রে তাৎপর্য বহন করে। যেমন- বৈরুতে অবস্থিত সেন্টার ফর আরব ইউনিটি স্টাডিজ কিংবা দোহাতে অবস্থিত আরব সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি স্টাডিজ, যাদের ব্যাপ্তি ও সাফল্য বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়ে গেছে। জ্ঞানের নির্যাস উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন তাদের বিবর্তন সম্পর্কে নতুন তর্কের সূচনা করতে আবশ্যকতা তুলে ধরে। লেখক যেমনটা বলছেন, এক্ষেত্রে যদি এটাই হয়ে থাকে, এই প্রতিষ্ঠানগুলো একাডেমিক গবেষণার প্রতিস্থাপক হয়ে উঠতে পারবে না। এই "অপ্রচলিত" স্পেস এবং তাতে ক্রিয়াশীল ঘটক কি সামাজিক বিজ্ঞানের "আনুষ্ঠানিক" সংকট সৃষ্টি করছে?

বামিয়েহ-এর নাগরিক সমাজ ও সামাজিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত মন্তব্য থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, লেখক তাদের অবদানকে ব্যবহারিক উদ্দেশ্যের জায়গা থেকে স্বীকৃতি দেন। এক্ষেত্রে নথিবদ্ধ উপাত্ত তুলে ধরে জ্ঞানতাত্ত্বিক বিবেচনার জায়গা থেকে এর বিচার করেন।

>>

তবে তিনি "একাডেমিক কমিউনিটির মত" না বলে "একাডেমিক-কমিউনিটি" বলার পক্ষে স্পষ্ট যুক্তির অবতারণা করেন। "পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী [যারা] [তাদের] কাজ সম্পন্ন করে, তাঁর মতে, তাঁদের প্রত্যেকেই কঠোরভাবে পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ, সেই আলোকে অগ্রগতিমুখর সিদ্ধান্ত এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসযোগ্যতার দিকে নিজেদের নিবিষ্ট করে। সাধারণভাবে তারা প্রতিদিনের সংগ্রাম এবং উন্নতর রাজনৈতিক মনোভাব থেকে দূরুত্ব বজায় রাখে-কারণ এগুলো জ্ঞান উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন কাজে আসে না।" একইভাবে তিনি জার্নাল ও সংবাদপত্রের গবেষণা থেকে সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণার কোন বিষয়টি মানানসই এবং এর সঙ্গে "গভীরতা" আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে, এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি "জটিলতা" বা "নির্যাস সম্পর্কে অধিক জানা"র মাধ্যমে সৃষ্টি হয়।বামিয়েহ একটি উদাহরণের মাধ্যমে পদ্ধতিগতভাবে মানানসই হওয়ার ক্ষেত্রে যত্নশীল হওয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এটা নীতিনির্ধারণী প্রতিবেদনের চেয়ে শিক্ষাবিষয়ক গবেষণার ইঙ্গিত বহন করে।

এ যুক্তিটি লেখকের লক্ষ্যকে আরও বিপ্লবমুখী জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করে। বিশেষ করে আরব বসন্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক পরিবর্তনের বাদানুবাদ এবং আরব বিশ্বের সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্র উন্মোচনকে ব্যাখ্যা করতে উৎসাহী হয়। আমরা বলতে পারি যে, লেখকের ধ্রুপদী দৃষ্টিভঙ্গি-যা একটি "বিপ্লব"-এর জন্ম দেয়, তার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছেন। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের আরবের সামাজিক বিজ্ঞানী, যাদেরকে আরব বসন্তের প্রজন্ম হিসেবে বলা যায়, তাদের মধ্যে আরব বসন্তের ফলে সংঘটিত পরিবর্তনের প্রভাব বিবেচনায় বামিয়েহ-এর যুক্তি অপর্যাপ্ত। আর এই "আরব বসন্তের উত্তরসূরী"-রাই সামাজিকভাবে তাদের সম্পৃক্ততা ও পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্ট করে তোলে।

বামিয়েহ-এর আদর্শ দূরের, বিচ্ছিন্ন ও আরবের নৈর্ব্যক্তিক সামাজিক বিজ্ঞানীদের সুদূর অতীতের কোন দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। আরব বসন্ত একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক বিপ্লব হিসেবে যা নিয়ে আসতে পারত, তা হল, একটি বিশৃঙ্খল জায়গা যেখানকার সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করা প্রয়োজন, সেখান থেকে বাস্তবতার দিকে আলোকপাত করে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সংযোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দৃঢ়তার দিকে অগ্রসর হওয়া। এটা সামাজিক বিজ্ঞানের অনুসন্ধানকে কঠোর, বেমানান কাঠামোকে শৃঙ্খলিত না করে গবেষণার ক্ষেত্রে আরও সুদূরপ্রসারী আকাঙ্ক্ষাকে স্পষ্ট করে তোলে।

> সমাপ্তি

মোহাম্মদ বামিয়েহ যে বিষয়টিতে পৌঁছাতে চেয়েছেন, তার সঙ্গে আমার মতপার্থক্য রয়েছে। বামিয়েহ-এর একটি বৃহৎ ক্ষেত্রকে জরিপ করার উদ্দেশ্যে আলোচনার অবতারণা করেন। এটা আরব বসন্তের অতীত ও ভবিষ্যৎ অনুসন্ধান করার স্বরূপ হিসেবে আসে। এই প্রতিবেদন এখনও সাধারণভাবে আরব বসন্তকে সমর্থন করার পেছনে নিহিত যুক্তির প্রাবল্যের চেয়ে এর ক্রমোন্নতি ও প্রতিকূলতাকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে অধিক মনযোগী। তাঁর আলোচনার সমাপনীতে, তিনি "আরবের সামাজিক বিজ্ঞানকে, সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে নিরাপদ বলে সংরক্ষিত জ্ঞানশাখা এবং তাদের স্ব স্ব বৈচিত্র্যময়তায় উপযোগিতা সৃষ্টির আগে"-এর আরও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের আহবান করেন। এক্ষেত্রে একেবারে শেষের উদ্দেশ্য হল সম্পূর্ণরূপে চক্রাকার। এটা দেখায় যে, আরবের সামাজিক বিজ্ঞানকে আরও অনুসন্ধান করতে হবে। যেটাকে তাঁরা সাম্প্রতিক সময়ের সামাজিক অভ্যুত্থান হিসেবে দেখিয়েছেন।

সামাজিক বিজ্ঞানের উপস্থিতি স্বীকার না করে সম্ভবত আমাদের আরও চাঞ্চল্যকর বিষয়ের দিকে নজর দেয়া উচিৎ। যার সঙ্গে "স্থায়িত্ব," "স্থিতিস্থাপকতা," "সঙ্গতি,"কিংবা "জীবনধারণ" সংশ্লিষ্ট। প্রাতিষ্ঠানিক স্থাপনার, পদ্ধতির ওপর ভিত্তি না করে "আরব বসন্তের প্রজন্ম"-এর ওপর ভিত্তি করে। এটা কঠিন সন্ধিক্ষণ সৃষ্টি করে। আরব বিশ্বের সামাজিক বিজ্ঞান কেন স্বতন্ত্র, এর মধ্য দিয়ে তারা সেই বিষয়ে ধারণা লাভ করে থাকে। আরবের সামাজিক বিজ্ঞান একটি আত্মপরিচয়ের সন্ধানে রত। এক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচনের ফলে আমরা অনেকের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করার সুযোগ লাভ করে থাকি। সম্ভবত এই প্রতিবেদনটি যে চাহিদা সৃষ্টি করে, সেই পথে চলার ক্ষেত্রে একটি সক্রিয় সংলাপ তৈরির পথ তৈরি করা জরুরী।

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
Idriss Jebari <idrissjebari@gmail.com>

> জর্জ রিটজার

ম্যাকডোনাল্ডাইজেশন এবং যুগপৎ উৎপাদন ও ভোগ

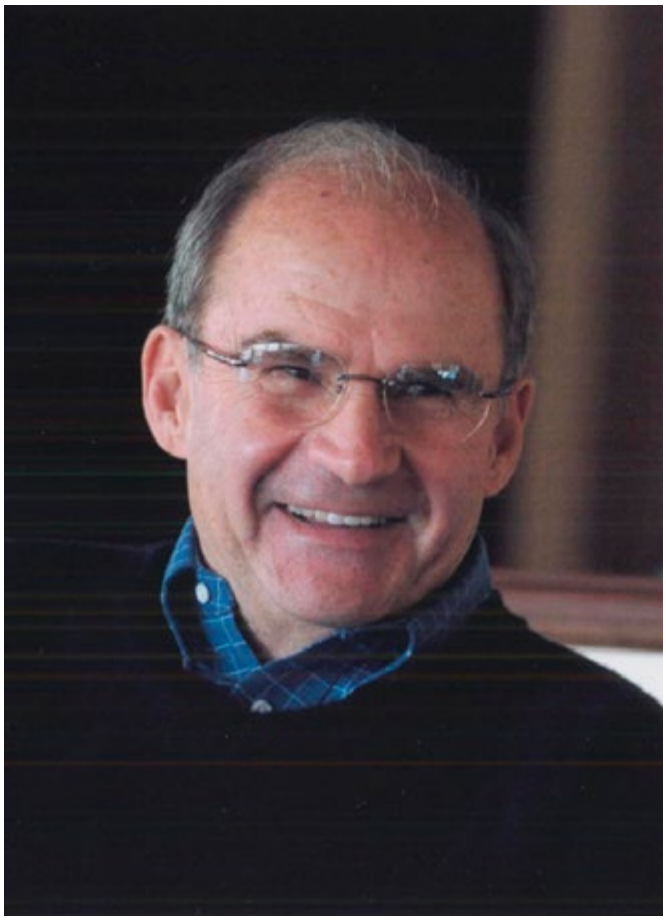

| *জর্জ রিটজার।*

জর্জ রিটজার একজন অন্যতম বিশ্বায়ন বিষয়ক তাত্ত্বিক এবং আমেরিকার মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক। কসভোর প্রিস্টিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী **ল্যাবিনট কুনুশেভকি** গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক তত্ত্ব প্রকল্পের হিসেবে এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন। আমরা এই সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ প্রকাশ করছি।

কুনুশেভকি: অধ্যাপক রিটজার, আপনি আপনার "ম্যাকডনাল্ডাইজেশন" তত্ত্বের জন্য সুপরিচিত। আপনি কি এটাকে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে দেখেন, নাকি মুক্ত বাজারে প্রতিযোগিতার ফল হিসেবে?

রিটজার: ১৯৯০ সালের পর থেকে আমার অধিকাংশ কাজই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাংস্কৃতিক সামাজ্যবাদ সম্পর্কিত। ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত আমার বই *The McDonaldization of Society*-তে "McDonaldization" বলতে একটি সামাজিক শক্তিকে বোঝানো হয়েছে যা'তার বৈশিষ্ট্যগুলো সমেত (যথা- দক্ষতা, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার, জবাবদিহিতা ও নিয়ন্ত্রণ এবং সংশ্লিষ্ট অযৌক্তিকতা) মূল ভিত্তিভূমি আমেরিকা থেকে বিশ্বের নানান দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। এটি দৃশ্যমান হয় ম্যাকডোনাল্ডস রেস্টুরেন্ট এবং অন্যান্য আমেরিকান ব্যবসায়ের বিশ্বায়নের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো-ম্যাকডোনাল্ডাইজেশন প্রক্রিয়া স্থানীয় পর্যায়ে অসংখ্য ব্যবস্থা এবং নানান সংগঠনের মধ্যে ঢুকে পড়ে, যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ।

১৯৯৫ সালে প্রকাশিত আমার বই *Expressing America: A Critique of the Global Credit Card Society*-এ আমি আরেক ধরণের সাংস্কৃতিক (এবং অর্থনৈতিক) সামাজ্যবাদের উপর আলোচনা করেছি: বিশ্বব্যাপী আরেকটা আমেরিকান বস্তু তথা ক্রেডিট কার্ডের বিস্তার। ক্রেডিট কার্ড আমেরিকান স্টাইলের ঋণ এবং ভোগবাদের বিস্তার ঘটাচ্ছে যা' নিয়ে আমি সরাসরি আলোচনা করেছি আমার *Enchanting a Disenchanted World: Revolutionizing the Means of Consumption* (1997) বইয়ে। এখানে আমি ভোগের উপায়সমূহকে (means of consumption) বিবেচনা করেছি মার্ক্সের উৎপাদনের উপায় (means of production) প্রত্যয়ের সম্প্রসারিত রূপ হিসেবে। আমেরিকার প্রধান প্রধান ভোগের স্থানগুলো হলো ফাস্টফুড রেস্টুরেন্ট, শপিংমল, থিমপার্ক (যথা, ডিজনি ল্যান্ড), লাস-ভেগাসের মতো ক্যাসিনো এবং বৃহদাকার জাহাজে চড়ে সমুদ্রভ্রমণ। এগুলোর সবই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে এবং ভ্রমণকারীদের মাঝে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এসবের বিশাল আকার এবং ধর্মের ন্যায় "যাদুকরী" আকর্ষনক্ষমতা লক্ষ্য করে আমি এদেরকে বলি "ভোগের মন্দির (cathedrals of consumption)"। বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এইসব ভোগের মন্দির আমেরিকার উগ্র-ভোগবাদকে সারাবিশ্ব ছড়িয়ে দিচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বই, অন্তত: আমার কাছে, হলো *The Globalization of Nothing*। এখানে আমি "নাথিং (nothing)" বলতে আমি বুঝিয়েছি সেইসব সামাজিক বস্তু ও বিষয় যা' কেন্দ্রীয়ভাবে এবং যা'র কোন স্বাতন্ত্র্য অবয়ব নেই। সভাবতই ম্যাকডোনাল্ডস এবং এর পণ্যসমূহ (যথা, বিগ ম্যাক)-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু ভোগের মন্দিরের মধ্য দিয়ে "নাথিং (nothing)" ক্রমাগতভাবে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে, যা' স্থানীয় পর্যায়ে ধারণাকৃত ও নিয়ন্ত্রিত এবং স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত "সামথিং (something)" কে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। এর মধ্যদিয়ে ক্রমাগতভাবে আমরা "নাথিং (nothing)" বৈশিষ্ট্যের একটা উন্নতবিশ্বে উপনীত হচ্ছি।

কুনুশেভকি: আপনি ভোগের বিশ্বায়নের ধারণাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করেছেন। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আপনার মন্তব্য কি?

রিটজার: আমি আজকালকার বিশ্ববিদ্যালয়কে অনেক সময় ম্যাক-বিশ্ববিদ্যালয় বলে থাকি। কারণ, এটি শিক্ষার ক্ষেত্রে ম্যাকডোনাল্ডসের রেস্টুরেন্টের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে; যেখানে সম্ভাবনাময়িতা, জবাবদিহিতা ও নিয়ন্ত্রণের উপর জোর দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে ব্যাপকভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

>>

কিন্তু একইসাথে যৌক্তিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে অযৌক্তিকতাও রয়ে গেছে, অর্থাৎ নেতিবাচক ফলাফল দৃশ্যমান হচ্ছে সামগ্রিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষার মান অবনমনে। এটি আসলে ফাস্টফুড রেস্টুরেন্ট যেভাবে খাবারের মানের অবনমন করেছে (যেমন, ফাস্টফুড রেস্টুরেন্টে বিগ ম্যাক পাওয়া যায়, কিন্তু সুস্বাদু ম্যাক পাওয়া যায় না), ঠিক তারই অনুরূপ যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়, কিন্তু সুশিক্ষা পাওয়া যায়না। এর প্রক্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে কায়েমি স্বার্থের প্রতিরোধের বদলে তাদের স্বপক্ষে নিয়ে আসে। আমার মনে হয়, ম্যাক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ক্রমান্বয়ে জ্ঞান এবং এর বিস্তারের উপর একক কর্তৃত্ব স্থাপন করতে যাচ্ছে। আমার সর্বশেষ গবেষণার বিষয় হচ্ছে " যুগপৎ উৎপাদন ও ভোগ (prosumption)" যা' মূলত: উৎপাদন ও ভোগের সমন্বয়। শিক্ষার্থীরা হলো "যুগপৎ উৎপাদক ও ভোক্তারা (prosumers)" যারা একই সাথে জ্ঞান ভোগ করে এবং উৎপাদনও করে। তারা উৎপাদনব্যবস্থার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ভোক্তা নয়। বরং তাদের কাছে উপস্থাপিত জ্ঞানকে তারা সক্রিয়ভাবে পুনরুৎপাদন করে।

কুনুশেভকি: আপনি দারুণ সক্রিয় লেখক হিসেবে সুখ্যাত। এ কারণে আপনার কাছ থেকে আরও বেশি বেশি করে নতুন এবং আকর্ষনীয় লেখা আশা করি। সেসব সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বলবেন কি?

রিটজার: বিগত দশকে আমার অধিকাংশ কাজই যুগপৎ উৎপাদন ও ভোগ (prosumption) নিয়ে। আমরা সর্বদাই যুগপৎ উৎপাদক ও ভোক্তা (prosumers), কখনই শুধু উৎপাদক বা ভোক্তা না। উদাহরণস্বরূপ, ইন্টারনেট যেখানে আমরা ব্লগ, ফেসবুক ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যুগপৎ উৎপাদন ও ভোগ করি। একইভাবে, ভোগের মন্দিরসমূহেও আমরা ভোগ করতে গিয়ে ক্রমাগতভাবে অনেক কাজ করি যেগুলো আগে ছিল বেতনভুক্ত কর্মচারীদের কাজ (যেমন, ফাস্টফুড রেস্টুরেন্টে ওয়েটারের বদলে আমরা নিজেরাই নিজেদের খাবার বহন করি, পরিত্যাক্ত খাবার ও বর্জ্য পরিষ্কার করি)। সম্প্রতি আমি দাবি করছি যে, আমরা বসবাস করছি একটা "যুগপৎ উৎপাদক ও ভোক্তা পুঁজিবাদ (prosumer capitalism)" বিশ্বে যেখানে পুঁজিপতিরা বেতনভুক্ত কর্মচারিদের বদলে স্বল্প বেতনের বা বিনা বেতনের ভোক্তাদেরকে প্রাধান্য দিচ্ছে। উবার-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই ভোক্তাদের সংখ্যাবৃদ্ধির সাথে সাথে (যারা নিজেরাই উবারের চালক এবং যাত্রী) সাথে প্রতিযোগিতার মুখে ট্যাক্সি চালকরা ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে। যখন আমরা Amazon.com-এ বইয়ের ফরমায়েশ দেই, তখন আমরা শুধু বই (এবং অন্যান্য পণ্য) ভোগই করি না, আমরা আমাদের চাহিদা তৈরিও করি বিনা পারিশ্রমিকে। এর ফলে বইয়ের দোকান এবং এর সাথে বই বিক্রেতারাও হারিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে নব্য পুঁজিপতিদের আবির্ভাব হচ্ছে (Mark Zuckerberg, Jeff Bezos) যারা বেতনভুক্ত কর্মচারীদের স্থলে অবৈতনিক ভোক্তাদেরকে দিয়ে মাল্টি-বিলিয়নিয়ারে পরিণত হচ্ছে। ভোক্তারা কেবলমাত্র অবৈতনিকই নয়, তাদেরকে অন্য কোন সুবিধা, স্বাস্থ্য বীমা কোনকিছুই দিতে হয় না। নতুন প্রযুক্তি (যথা, রোবটস) ব্যবসায়ীদেরকে আরও বেশি করে ভোক্তাদের জন্য উপযোগী করে তুলবে [অথবা এগুলো নিজেরাই "উৎপাদন ও ভোগকারী যন্ত্র (prosuming machines)" হিসেবে ভোক্তায় পরিণত হবে]। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
জর্জ রিটজার <gritzer@umd.edu>
ও ল্যাবিনট কুনুশেভকি <labinotkunushevci@gmail.com>>

> ৪০+ বছর ধরে
আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান

এডওয়ার্ড এ. টিরাকিয়ান, ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়, ইউএসএ, এবং আইএসএ-এর ইতিহাসের সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা কমিটির সদস্য (আরসি ০৮), সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব (আরসি ১৬) ও ধর্মের সমাজবিজ্ঞান (আরসি ২২)

১৯৭৪ সালে কানাডার টরন্টো শহরে অনুষ্ঠিত আইএসএ কংগ্রেসের পোস্টার-প্রথম কংগ্রেস যেখানে এডওয়ার্ড টিরাকিয়ান অংশগ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক সমাজতাত্ত্বিক সংস্থার (International Sociological Association) সাথে দীর্ঘ সংযুক্ততার কিছু স্মৃতি ভাগাভাগি করার আমন্ত্রণ পাওয়া একটি আনন্দের বিষয়। সতর্কীকরণ হিসেবে আমার অতীত স্মৃতি পূর্ণ বা সময়ের অতলে মলিন নয়। পাঠকেরা নিঃসন্দেহে জেনিফার প্ল্যাট -এর চমৎকার প্রতিবেদন *A Brief History of the ISA, 1948-1997* থেকে উপকৃত হবে।

সমাজবিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক অঙ্গন সবসময় আমাকে আকর্ষণ করে। ঠিক সমাজবৈজ্ঞানিক তত্ত্বে আমার প্রবল আগ্রহ যেভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিক সংস্থা (American Sociological Association)-আসা (ASA)-এর সাথে যুক্ত হওয়ায়, বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমি আসা'র (ASA) কমিটিতে কাজ করেছি। আমি আসা (ASA)-এর সভাপতিও হয়েছিলাম যখন পূর্ববর্তী সভাপতি রুবেন হিল (১৯৭০-৭৪) সালে আসার সভাপতি হয়েছিলেন। রুবেন আমাকে আইএসএ-তে যোগদানে আমন্ত্রণ করেছিল। সে খুব আশা করত আমেরিকান সমাজবিজ্ঞান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরেও উদ্যোগী হবে। আমার প্রথম সুযোগ আসে ১৯৭৪ সালে; যেখানে রুবেন টরন্টোতে আইএসএ-এর অষ্টম ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসের জন্য রাশিয়ান সমাজবিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। অবিলম্বেই আইএসএ(ISA)-এর সভার পরে প্রতিনিধিদের মন্ত্রিয়লে অনুষ্ঠিত আসা'র (ASA) সভায় আমন্ত্রণ জানান হয়। উভয় সভাতেই, আমাদের বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা কমিটি বিদেশি পর্যটকদের সাথে একটা সেতুবন্ধন করে দেয়। বিশেষ করে আমি রাশিয়ান সমাজবিজ্ঞানীদের সাথে সাক্ষাতের কথা স্মরণ করি; যখন অভ্যর্থনার আনন্দঘন পরিবেশ সামষ্টিক উত্তেজনায় পরিণত হলো, যেন স্নায়ুযুদ্ধের ধকল অতিদ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল। রুবেন হিল ও সভাপতি পিটার ব্লাউ উভয়ের জন্যই যৌথ সভাটি সমাজতাত্ত্বিক কূটনীতির বিজয়োৎসব হিসাবে প্রমাণিত হল।

এরপর আমি আইএসএ-এর আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ করি-আমার এ যাবৎ করা শ্রেষ্ট বিনিয়োগের একটি। আমি মনে করতে পারি সুইডেনের উপসালায় অনুষ্ঠিত নবম কংগ্রেস; কিভাবে সুইডেন একই সাথে সবচেয়ে ব্যয়বহুল ও অত্যাধুনিক ছিল। সম্ভবত কারণ ছিল উপসালা (টরন্টো বা স্টকহোম-এর মতো নয়) যা পণ্ডিতদের আন্তর্জাতিকভাবে একত্রিত হওয়ার প্রধান আকর্ষণ। কোন বড় শহরও নয়। তাই এ স্থানটি বিভিন্ন দেশ থেকে অভ্যাগত পন্ডিতদের দৃষ্টিগ্রাহী হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতদের যোগাযোগের উপলক্ষ্যে পরিণত হয়। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের পণ্ডিতদের কাছে। উপসালার পরে, মেক্সিকো সিটিতে

>>

আইএসএ (ISA)-এর ১০তম সভাতে (১৯৮২) স্প্যানিশ ভাষাতে অনেকগুলো সেশন হয়েছিলো। এটা আইএসএ-এর তৃতীয় দাপ্তরিক ভাষা। এটা অ্যালেইন তুরাইন লাতিন আমেরিকার ছাত্র হিসেবে বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছিল। এটা বলতেই হবে, তুরাইন পৃথিবীর অন্যান্য কংগ্রেস ও ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনারগুলোতে বিশ্ব সমাজবিজ্ঞানের একজন অগ্রসরমান বিজয়ী।

১৯৮২ সালের আইএসএ-এর সভা আয়োজন করতে গিয়ে আমরা আর্থিক অনটনে পড়ি এবং মেক্সিকোর অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন দেশটি তার ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না যা অর্থনৈতিক সংকটকে আরও বাড়াতে থাকে। আইএসএ-এর প্রতিনিধিদের মেক্সিকান ব্যাংক থেকে একই সময়ে ডলার পেতে ঠেলাঠেলি থেকে দূরে রাখা হয়; কিন্তু আর্থিক যোগাযোগ ভেঙে পরে, এতে বিনিময় হারের উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। সেই হার শুধু রাতারাতি পরিবর্তনই হয়নি কিন্তু একই ব্যাংকের বিভিন্ন শাখাগুলোও জানতো না যে মেক্সিকোর কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডলারের কি হার নির্ধারণ করছে। আইএসএ-এর কিছু সদস্য যাদের ক্রেডিট কার্ড সুবিধা ছিল তারা তাদের হোটেল কক্ষ স্ট্যান্ডার্ড থেকে ডিলাক্সে উন্নীত করতে পারতো, যেহেতু মেক্সিকান মুদ্রা পেসোর দর পতন হয়েছিল এবং ডলারের দাম ঊর্ধ্বগামী ছিল। তাই সকলেই এতে লাভবান হয়নি এবং কি অনেকেই প্রথম প্রাপ্ত ফ্লাইটেই মেক্সিকো ত্যাগ করেছিল।

যতদূর মনে পড়ে, এটাই ছিল একমাত্র সভা যা ঘটেছিল ঘটনাবহুল সংকটের মধ্যে দিয়ে। মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ সভা ছিল ভালো, ব্যতিক্রমী তাপ সংরক্ষণ এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের অনুপস্থিতি। বিলেফেল্ডে (১৯৯৪) অনুষ্ঠিত আইএসএ-এর ১৩তম সভায় রিচার্ড গ্রাথভ অনেক সংখ্যক পলিশ ও অন্যান্য পূর্ব ইউরোপিয়ান সমাজবিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন যারা সমাজবিজ্ঞানকে বাঁচিয়ে রেখেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের অত্যাচারের সময়ে, যার পতন হয়েছিল ১৯৯১ সালে।

গ্রাথভের সাথে আমার অনেক মিল আছে; যিনি গুণগত এবং ব্যাখ্যামূলক সমাজবিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্বের কেন্দ্রে। আমি খুব আনন্দিত হয়েছিলাম যখন তিনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞানের সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য হিসাবে আমার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য। আর এটা সে সময়ের কথা যখন (১৯৯১-১৯৯৬) তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। আমি সম্পাদনা পরিষদে যোগদান করি যখন মারটিন আলব্রু *আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান (International Sociology)* পত্রিকার প্রথম সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হন (১৯৮৪-১৯৯০)। আমি এমন একটি পত্রিকার অবদানকারী ও সমালোচকের দায়িত্ব ভীষণ উপভোগ করেছি, যা আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞানের প্রাথমিক ধারণা থেকে তুলনামূলক জ্ঞান দেয়।

যদিও আইএসএ-এর সকল সভাতে উপস্থিত থাকা অনেকসময় অসম্ভব ছিল (অবসরে যাবার পর ভ্রমণের খরচের ব্যবস্থা এবং অনেক সময় একই সময়ে আসা (ASA) ও আইএসএ-এর সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য)। তারপরও সাম্প্রতিক অনেকগুলো সভাতে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি আনন্দিত: মন্ট্রিয়ল (১৯৯৮), ব্রিসবেন (২০০২), গোটেবার্গ (২০১০), ইয়কোহামা (২০১৪) এবং সাম্প্রতিক ভিয়েনাতে আইএসএ-এর তৃতীয় ফোরাম (২০১৬)।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত পুরোনো বন্ধুদের দেখে (দুর্ভাগ্যক্রমে ক্রমহ্রাসমান সংখ্যা), নতুনদের সাক্ষাৎ পেয়ে এবং বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতির নতুন সমাজতাত্ত্বিক ধারণার সম্মুখীন হওয়া- এখনো আমাকে প্রলোভিত করে। ঠিক যেমন আমি প্রথম আন্তর্জাতিক সমাজতাত্ত্বিক সংস্থায় যোগ দিতে পেরেছিলাম এবং এটি অবশ্যই আমাকে ২০১৮ সালের টরেন্টোতে অনুষ্ঠিতব্য ১৯তম সভাতে যোগদানে আকৃষ্ট করবে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
Edward Tiryakian <durkhm@soc.duke.edu>

> পরিচিতি

জাপানিজ দ্বিতীয় সম্পাদনা পরিষদ

গ্লোবাল ডায়ালগ-এর পাঠকদের কাছে জাপানিজ দ্বিতীয় সম্পাদনা পরিষদকে পরিচয় করে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে, *গ্লোবাল ডায়ালগ*-এর অনুবাদ প্রকল্পের কাজ শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত ন্যাশনাল ফিশারিজ ইউনিভার্সিটির পঁয়তাল্লিশ জন স্নাতকে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা এতে কাজ করে। ন্যাশনাল ফিশারিজ ইউনিভার্সিটি ১৯৪১ সালে জাপানের কৃষি, বনায়ন ও মৎস্য মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয়টিকে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ *গ্লোবাল ডায়ালগ*-এর জাপানিজ দ্বিতীয় সম্পাদনা পরিষদের স্থায়ী সদস্য।

সাতোমী ইয়ামামোতো ফিশারিজ ডিস্ট্রিবিউশন এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের ইংরেজি ও সমাজবিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক। তিনি জাপান উইমেন'স ইউনিভার্সিটি থেকে এম. এ., শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সামাজিক বিজ্ঞানে এম.এ. এবং ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়, উরবানা-ক্যাম্পেইন থেকে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি আমেরিকার আক্রমণকারী মৎস্যপ্রজাতির সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিয়ে গবেষণা করছেন।

হুমা সেকিগোচ্ছি ডিপার্টমেন্ট অব ফুড সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজির স্নাতকের জ্যেষ্ঠ ছাত্র। তিনি ইয়ামাগোচ্ছি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং চিবা জেলায় বেড়ে ওঠে। হুমা ন্যাশনাল ফিশারিজ ইউনির্ভাসিটি থেকে ছুটি নিয়ে বর্তমানে আমেরিকার কালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনি-র্ভাসিটির, চিকো এ্যান্ড বিউট কলেজে অধ্যয়নরত। সে বিশ্বাস করে যে, ব্যর্থতা মানুষকে সফল হতে শেখায়। হুমা সাঁতার কাটতে, বেইসবল খেলতে এবং ইংরেজি পড়তে ভালবাসে।

ইয়াতারো শিমোকাওয়াহ ডিপার্টমেন্ট অব ফুড সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজির স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। বর্তমানে সে সামুদ্রিক খাদ্য উপাদানের কার্যকর ব্যবহার এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি নিয়ে লেখাপড়া করছে। ইংরেজি পড়ার দক্ষতা বাড়ানোর জন্য ইয়াতারো *গ্লোবাল ডায়ালগ* -এর অনুবাদ প্রকল্পে যুক্ত হয়। ইংরেজিতে লেখা খাদ্য বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণা নিবন্ধ পড়ার দক্ষতা বাড়ানোই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য।

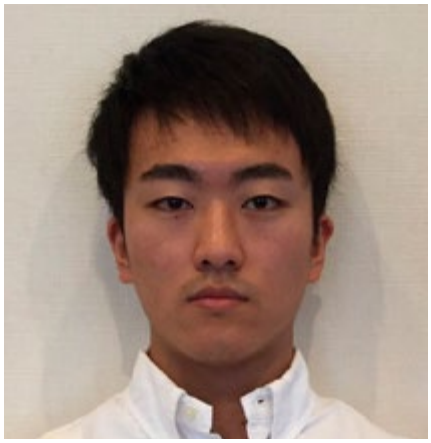

মাসাকি ইয়োকোতাহ ডিপার্টমেন্ট অফ ফুড সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজির স্নাতকের জ্যেষ্ঠ ছাত্র। সে ২০১৪ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডে ইংরেজিতে লেখাপড়া করে এবং আইইএলটিএস (ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ টেস্টিং সিস্টেম) পরীক্ষায় ৬.৫ পেয়েছে। সে ব্যাডমিন্টন খেলতে ও ফুটবল খেলা দেখতে পছন্দ করে। তার পছন্দের ফুটবল দল চেলসি ফুটবল ক্লাব, লন্ডন। তাঁর স্বপ্ন পৃথিবী ভ্রমণে বের হওয়া।

তাকাশি কিতাহারাহ ডিপার্টমেন্ট অফ ফুড সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজির স্নাতকের জ্যেষ্ঠ ছাত্র। সে ২০১৭ সালের এপ্রিলে ন্যাশনাল ফিশারিজ ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট স্কুল অফ রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড ফুড সায়েন্স বিভাগে যোগদান করবে। তাঁর স্নাতকের গবেষণা অভিসন্দর্ভ জাপানে নন-ফিডিং একুয়াকালচার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিকাশ অনুসন্ধান করে। মৎস্যবিজ্ঞান ছাড়াও নতুন নতুন বিষয়ে জানার আগ্রহ তাকে এই অনুবাদ প্রকল্পে যুক্ত হতে উৎসাহী করে তোলে।

ইউকী নাকানোহ ডিপার্টমেন্ট অফ এপ্লাইড একুয়াবায়োলজির স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। শৈশব থেকে প্রাণি ও মৎস্যকূলে আগ্রহ তাকে ন্যাশনাল ফিশারিজ ইউনিভার্সিটিতে পড়তে উৎসাহিত করে। যদিও ইউকী তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা স্থির করেননি তবুও তিনি তার বিশেষায়িত বিষয়ের উপর চাকুরি করতে ইচ্ছুক। কখনো কখনো জাপানিজ ভাষায় অনুবাদ করতে গিয়ে ইউকী আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তবুও তিনি এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত। কারণ এটি তাকে ইংরেজি ভাষার উপর দক্ষতা বাড়াতে এবং জাপানিজ ভাষায় নিজেকে পারদর্শী করে তুলতে সহায়তা করবে।